অল্প খরচে উন্নত মাছ চাষ

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
খুলনা বিভাগ, খুলনা
www.fisheries.khulnadiv.gov.bd

অল্প খরচে
উন্নত মাছ চাষ

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা

প্রকাশকালঃ জুলাই ২০২৫ খ্রি.
মুদ্রন সংখ্যাঃ ৭০০০ কপি
মুদ্রণঃ ফ্রেন্ডস্ প্রিন্টার্স, ১০৭, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা
মোবাইলঃ ০১৯২৫-৩২২৮৪২, ০১৭১১-০২৯৫৩৯

দু'টি কথা

উৎপাদন বেড়েছে প্রায় প্রতিটি সেক্টরে। ইলিশ, মাছ, মুরগী, ডিম, পেয়ারা, লিচু, বরই ইত্যাদি প্রায় সকল ক্ষেত্রে। গ্রামের ছোট্ট বাজারে গেলেও মুরগী বা ডিমের সারি, পৃথক মাছের বাজার দেখা যায়। আর শহরের আনাচে-কানাচে রংবে রঙ্গের দেশি-বিদেশি ফলের দোকান চোখে পড়ে। পূর্বে বাড়ীর উঠানের পেয়ারা গাছ বা পুকুরের পাড়ের বরই গাছের ফলই খাওয়া হতো। এখন কৃষি জমিতে পেয়ারার বাগান, লিচুর বাগান বা বরই এর বাগান প্রায় প্রতিটি এলাকায়। পূর্বে আপেল-বেদানা কেনা হতো রোগীর পথ্য হিসেবে। আর এখন নিত্য এসব ফল খাওয়া হয়। তারপরেও পাল্লা দিয়ে দ্বিগুণ হারে বাড়ছে ঔষধের দোকান। হাসপাতালে সংকুলান হয় না। কারণ একটাই আর তাহলো আমরা যা উৎপাদন করছি তার প্রায় সিংহভাগ ভেজাল বা অনিরাপদ। খাদ্য চাই বা উৎপাদন বাড়াও এই দিক্ষায় দিক্ষিত হয়ে নিরাপদ পণ্য উৎপাদনের বিষয়টি মাথায় আসেনি।

মাছচাষের মূলমন্ত্র ছিল "ভালো পানি, নিরাপদ মাছ, অধিক উৎপাদন, অল্প খরচ।" অথচ ফেইসবুক, ইউটিউব বা বিভিন্ন কোম্পানীর প্রতিনিধিদের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাছচাষিদের কাছে মূলমন্ত্র হয়ে দাড়িয়েছে "পোনা ছাড় আর বেশি করে খাবার দাও।" একারণেই উৎপাদন খরচ বাড়ছে। লাভ হচ্ছে কম। উৎপাদিত হচ্ছে অনিরাপদ মাছ। যা আমাদের নিজেদের জন্য ক্ষতিকর। রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাধা। তাই অবশ্যই আমাদের এভাবে মাছ চাষ থেকে ফিরতে হবে। পুস্তিকাটিতে কিভাবে অল্প খরচে অধিক নিরপাদ মাছ উৎপাদন করা যায় সেই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি মৎস্য চাষিগণ এখান থেকে উপকৃত হতে পারবেন। দেশ ও জাতির কল্যাণ হবে।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপপরিচালক

সূচীপত্র

১।	মাছচাষে উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার কারণসমূহ	৩-৬
২।	যে সকল নিয়ামক মাছের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে	৭-১৭
৩।	ভাল পানি, নিরাপদ মাছ, অধিক উৎপাদন, অল্প খরচ	১৮-২০
৪।	মাছচাষের মৌলিক বিষয়াবলী	২১-২২
৫।	অল্প খরচে গুণগতমানের মাছ চাষ কৌশল	২৩-৫৭
৬।	পুকুরের কিছু সাধারণ সমস্যা ও তার প্রতিকার	৫৮-৬২
৭।	মাছের কতিপয় রোগ-বালাই ও তার প্রতিকার	৬৩-৬৯
৮।	মাছচাষে কতিপয় নিরাপদ রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার	৭০-৭২

আমরা মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমানে চাহিদার বিপরিতে প্রায় ১, ৮৪,০০০ মে.টন উদ্বৃত্ত। আগামীতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরও বাড়বে। বাজারে কোন পণ্যের যোগান তার চাহিদার তুলনায় বেশি হলে মূল্য কমে যায়। প্রায়শঃই চাষিদের মুখে শোনা যায় মাছের বাজার মূল্যের তুলনায় উৎপাদন খরচ বেশি। মাছ বিদেশে রপ্তানী করা প্রয়োজন।

বিদেশে মাছ রপ্তানীর ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। তাহলো- ১) মাছের গুণগতমান। ২) মাছের উৎপাদন খরচ। কারণ গুণগতমানের মাছ উৎপাদন করতে না পারলে তা বিদেশে মাছ রপ্তানী করা যাবে না। আর উৎপাদন খরচ না কমাতে পারলে অন্যান্য রপ্তানীকারক দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা যাবে না। এখানে কিভাবে উৎপাদন খরচ কমিয়ে গুণগতমানের অধিক মাছ উৎপাদন করা যায় সেই দিকটি আলোচনা করব। উৎপাদন খরচ কমানোর ক্ষেত্রে যে কার্যক্রমগুলো গ্রহন করা হয় তাতে গুণগতমান সম্পন্ন মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্র তৈরি হয়।

মাছচাষে উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার কারণসমূহ

আমরা অল্প খরচে মাছের কাঙ্খিত উৎপাদন চাই। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছ আহরণের পর আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান তেমন একটা থাকছে না। অর্থাৎ উৎপাদন খরচ ও মাছ বিক্রয় থেকে লব্ধ আয়ের ব্যবধান কম হয় বা লাভ কম হয়। তাই "মাছচাষে উৎপাদন খরচ বেশি" এটি এখন মৎস্যচাষিদের নিকট একটি বড় সমস্যা। নানা কারণে মাছচাষে উৎপাদন খরচ বেড়ে যেতে পারে। যে সকল কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় তার কতিপয় নিম্নরূপ-

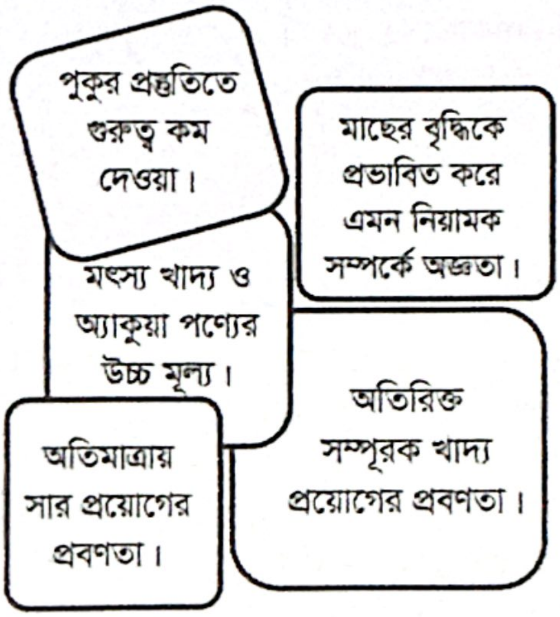
পুকুর প্রস্তুতিতে গুরুত্ব কম দেওয়া।
মাছের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক সম্পর্কে অজ্ঞতা।
মৎস্য খাদ্য ও অ্যাকুয়া পণ্যের উচ্চ মূল্য।
অতিরিক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের প্রবণতা।
অতিমাত্রায় সার প্রয়োগের প্রবণতা।

১) পুকুর প্রস্তুতিতে গুরুত্ব কম দেওয়া

মাছচাষের তিনটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। তবে পুকুর প্রস্তুতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ চাষি এটি তেমন একটা আমলে নেন না। সঠিকভাবে পুকুর প্রস্তুত করতে গেলে কয়দিন সময় লাগে। কিন্তু চাষিরা তড়িঘড়ি করে পোনা ছাড়তে চান। তারা মনে করেন যত তাড়াতাড়ি পোনা ছাড়া যাবে পোনা বড় হওয়ার জন্য তত বেশি সময় পাবে।

কিন্তু যথাযথভাবে পুকুর প্রস্তুত না করলে পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলীর ভারসাম্য থাকে না। পানির পরিবেশ নষ্ট হয়। চাষের এক পর্যায়ে পুকুরে নানা ধরণের সমস্যা তৈরি হয়। মাছের দেহে পীড়ন শুরু হয়। এতে মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। যতই খাদ্য প্রয়োগ করা হোক না কেন।

আবার পুকুরের সমস্যা দূরিকরণে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ ও অ্যাকুয়া পণ্য প্রয়োগ করা হয়। এসব অ্যাকুয়া পণ্যের মূল্য বেশ চড়া। এতে দেখা যায় উৎপাদন খরচের বড় একটা অংশ অহেতুক এসব অ্যাকুয়া পণ্য বাবদ ব্যয় হয়।

২) অতিরিক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের প্রবণতা

অধিক উৎপাদনের আশায় চাষিরা মাছকে পেট ভর্তি করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। বিভিন্ন খাদ্য কোম্পানীর প্রতিনিধির পরামর্শ বা ফেসবুক বা ইউটিউব দেখে চাষিরা পুকুরে অতিরিক্ত সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু প্রয়োগকৃত খাদ্য মাছের বৃদ্ধিতে কতটুকু সহায়কের ভূমিকা পালন করছে সেটিই মূখ্য বিষয়। দেখা যাচ্ছে খাদ্য প্রয়োগ করা হচ্ছে কিন্তু মাছ তেমন একটা বাড়ছে না। FCR বেড়ে যাচ্ছে। আর FCR বৃদ্ধি পাওয়া মানে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়া।

আধুনিক মাছ চাষ খাদ্য নির্ভর। কিন্তু আধুনিক মাছচাষের পুকুরে তিনটি সুবিধা থাকে। যেমন:

- এয়ারেটর সুবিধা;
- পানি পরিবর্তনের সুযোগ;
- মাছ আহরণের পর বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা।

এসব সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও চাষিরা বেশি পরিমানে খাদ্য প্রয়োগ করে থাকেন। পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করা হলে কিছু পরিমান খাদ্য অপচয় হয়। বিশেষ করে হাতে বানানো খাদ্যে ও ডুবন্ত খাদ্যে অপচয় বেশি হয়। তাই অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ মানে অতিরিক্ত অপচয়। এ অতিরিক্ত অব্যবহৃত খাদ্য পুকুরের তলায় জমা হয়। অর্থের বিনিময়ে কেনা উচ্চ মূল্যের খাদ্য জলাশয়ের তলায় জমা হয়ে এক সময় পচতে শুরু করে। এছাড়া অতিরিক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের কারণে মাছ পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য

গ্রহন করে না বা গ্রহন করার প্রয়োজন পড়ে না। এসব প্রাকৃতিক খাদ্য একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মৃত্যুবরণ করে তলায় জমা হয়। যা পচে পুকুরে ক্ষতিকর গ্যাস তৈরি করে ও দ্রবীভূত অক্সিজেন কমিয়ে দেয়। পুকুরের পানির p^h কমে যায়। মাছের ক্ষুধা মন্দা দেখা দেয়। মাছের বৃদ্ধির হার কমে যায়।

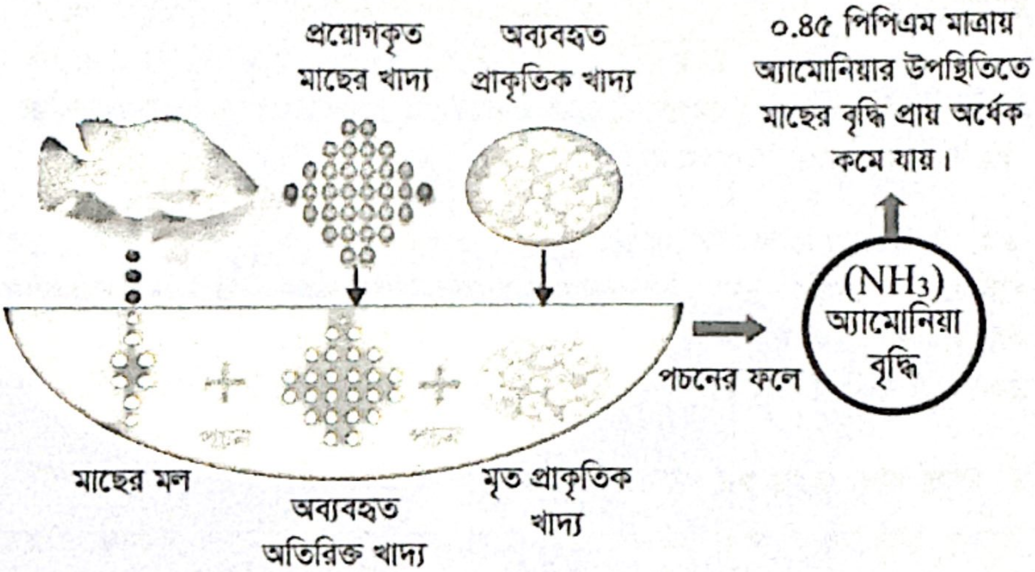
প্রয়োগকৃত মাছের খাদ্য
অব্যবহৃত প্রাকৃতিক খাদ্য
০.৪৫ পিপিএম মাত্রায় অ্যামোনিয়ার উপস্থিতিতে মাছের বৃদ্ধি প্রায় অর্ধেক কমে যায়।
(NH3) অ্যামোনিয়া বৃদ্ধি
পচনের ফলে
মাছের মল
অব্যবহৃত অতিরিক্ত খাদ্য
মৃত প্রাকৃতিক খাদ্য

অতিরিক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের প্রভাব

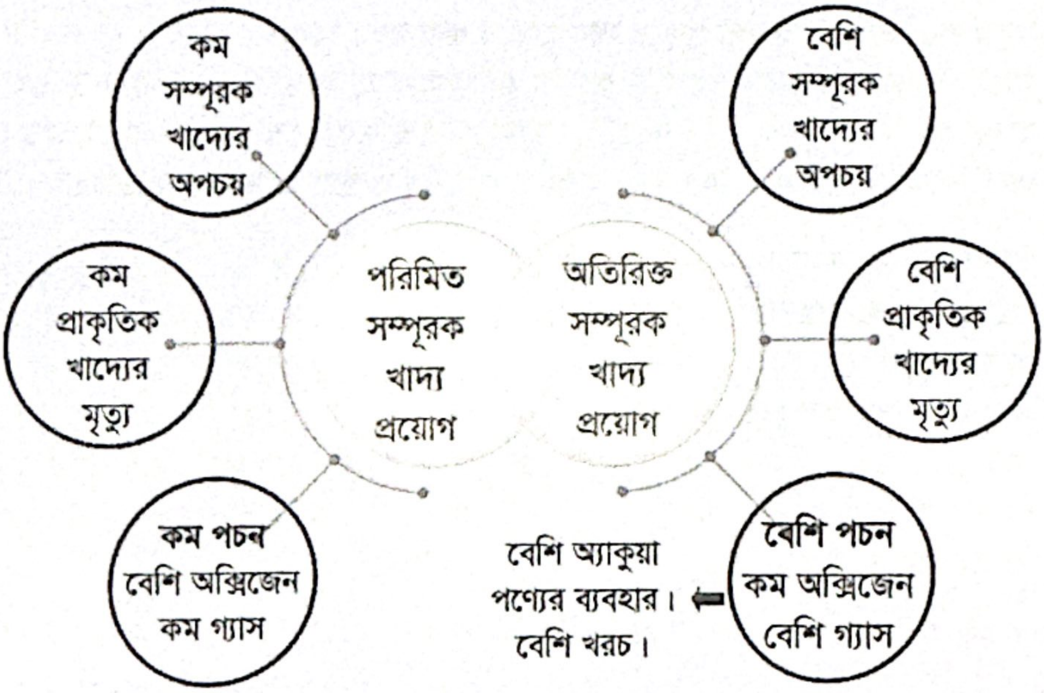
কম সম্পূরক খাদ্যের অপচয়
বেশি সম্পূরক খাদ্যের অপচয়
কম প্রাকৃতিক খাদ্যের মৃত্যু
পরিমিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ
অতিরিক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ
বেশি প্রাকৃতিক খাদ্যের মৃত্যু
কম পচন বেশি অক্সিজেন কম গ্যাস
বেশি অ্যাকুয়া পণ্যের ব্যবহার। বেশি খরচ।
বেশি পচন কম অক্সিজেন বেশি গ্যাস

৩) মাছের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক সম্পর্কে অজ্ঞতা

সাধারণত মাছচাষিরা মনে করেন পুকুরে মাছ ছেড়ে শুধুমাত্র বেশি করে খাদ্য প্রয়োগ করলেই মাছ বড় হবে। প্রকৃতপক্ষে মাছের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের পাশাপাশি অনেকগুলো নিয়ামক (যেমনঃ তাপমাত্রা, দ্রবিভূত অক্সিজেন, পিএইচ, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি) দায়ী। এসব নিয়ামকের অনুকূল পরিবেশ মাছের বৃদ্ধিতে খাদ্যের কার্যকারিতাকেও বাড়িয়ে দেয়। যা অনেক চাষি অবগত নন। যারা জানেন তারাও খুব একটা গুরুত্ব দেন না। ফলশ্রুতিতে যা হবার তাই হয়। উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় কিন্তু উৎপাদন আশানুরূপ হয় না।

তাই উৎপাদন খরচ কমিয়ে মাছের কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে পুকুরের পানির গুণগতমান ও যে সকল নিয়ামক মাছের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। সেই সাথে তা অনুকূল মাত্রায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার।

৪) মৎস্য খাদ্য ও অ্যাকুয়া পণ্যের উচ্চ মূল্য

যেহেতু চাষিদের প্রবণতা অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ। তাই চাষিদের দূর্বলতা কাজে লাগিয়ে খাদ্য কারখানার মালিকগণ ও অ্যাকুয়া পণ্য উৎপাদনকারীগণ প্রতিনিয়ত মৎস্য খাদ্য ও অ্যাকুয়া পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে চলেছেন।

৫) অতিমাত্রায় সার প্রয়োগের প্রবণতা

সবুজ শ্যাওলা তৈরির জন্য পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু অনেক চাষি বা খামারী তাদের পুকুরে পরিমানের থেকে অনেক বেশি সার ব্যবহার করেন। তাদের কথা হলো অল্প সারে পানিতে টেম্পার আসে না। এতে একদিকে অর্থের অপচয় হয়। অন্য দিকে রাসায়নিক সারের অতি ব্যবহার পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর।

পানির একটি রাসায়নিক গুণ হলে হার্ডনেস বা খরতা। খরতার মান ৪০-২০০ পিপিএম থাকা বাঞ্ছনীয়। খরতা কমে গেলে সেই পুকুরে রং আসে না। পুকুরে রং আসলেও বেশিদিন স্থায়ী হয় না। এজন্য চাষিরা প্রয়োজনের থেকে বেশি সার ব্যবহার করেন। দেখা গেল চাষকালীন সময়ে কোন কারণে পানির খরতা বেড়ে গেছে; সেই সময় চাষি অতিরিক্ত মাত্রায় সার প্রয়োগ করেছেন। এতে পুকুরে ফাইটোপ্লাংকটন ব্লুম দেখা দিবে। আর একবার ফাইটোপ্লাংক্টন ব্লুম মানেই মাছ চাষের ঐ সাইকেলে বিপর্যয় ডেকে আনা।

***

যে সকল নিয়ামক মাছের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে

অনেকগুলো নিয়ামক রয়েছে যা মাছের বৃদ্ধিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। এসব নিয়ামকের অনুকূল পরিবেশ মাছের খাদ্যের FCR কমিয়ে দেয়। FCR বা খাদ্য রূপান্তর হার হচ্ছে কত কেজি খাদ্য গ্রহণে কত কেজি মাছ উৎপাদন হয়। যে সকল নিয়ামক মাছের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো-

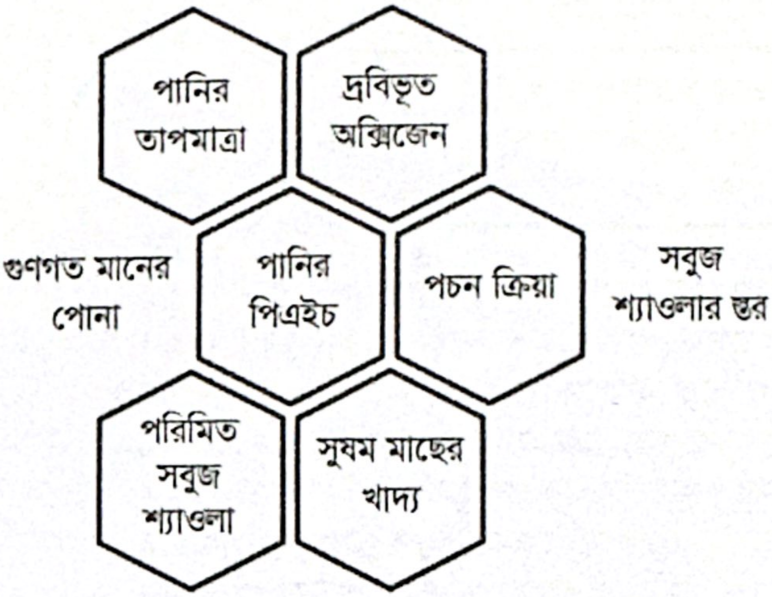
পানির তাপমাত্রা
দ্রবিভূত অক্সিজেন
গুণগত মানের পোনা
পানির পিএইচ
পচন ক্রিয়া
সবুজ শ্যাওলার স্তর
পরিমিত সবুজ শ্যাওলা
সুষম মাছের খাদ্য

১) তাপমাত্রা

তাপমাত্রা মাছের বৃদ্ধিকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। মাছ শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণি। পরিবেশের তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে মাছের শরীরের তাপমাত্রা ওঠা-নামা করে। তাই মাছ তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না। পানির তাপমাত্রা মাছের আচরণ, খাদ্য গ্রহন, শারীরিক বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তারে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে। তাপমাত্রা পানির অন্যান্য নিয়ামকসমূহের মাত্রাতেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মাছের পরিপাক ক্রিয়া (হজম ক্রিয়া) বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা কমে গেলে পরিপাক ক্রিয়া (হজম ক্রিয়া) কমে যায়। যে পুকুরে পানির তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস সেই পুকুরের পানির তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াসে উন্নিত করতে পারলে মাছের পরিপাক ক্রিয়া দ্বিগুণ হয়। পরিপাক ক্রিয়া দ্বিগুন হলে মাছের অক্সিজেন চাহিদাও দ্বিগুন হবে। হজম ক্রিয়া বাড়লে মাছের খাদ্য চাহিদা বাড়বে। মাছের বৃদ্ধি দ্রুত হবে। **মাছের সঠিক বৃদ্ধি জন্য পুকুরে পানির তাপমাত্রা ২৮°-৩০° সেলসিয়াস থাকলে আবশ্যক।**

২) দ্রবীভূত অক্সিজেন

দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছের বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। প্রাণির বেঁচে থাকার জন্য যেমন অক্সিজেন প্রয়োজন। তেমনি পেটের খাদ্য হজমের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। তাপমাত্রা বাড়লে মাছের পরিপাক ক্রিয়া বাড়বে ঠিকই কিন্তু পানিতে যথেষ্ট পরিমানে দ্রবীভূত অক্সিজেন না থাকলে পরিপাক ক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত খাদ্যের অপচয় হবে। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। **পুকুরের পানিতে ৪-৫ পিপিএম মাত্রায় দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকলে মাছের বৃদ্ধি ভালো হয়।**

পানিতে অক্সিজেনের উৎস
যেসব উৎস থেকে পানিতে অক্সিজেন যুক্ত হয় সেগুলো হলো-

১
বায়ুমন্ডল

২
সালোক
সংশ্লেষণ

বায়ুমন্ডল: বায়ুমন্ডলের বাতাস বিশেষ করে পানি সংলগ্ন বাতাস থেকে অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাতাস হতে পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার জন্য পুকুরের পানিতে বাতাসের ঢেউ বা আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাতাসের প্রবাহ পানিতে যত বেশি ঢেউ তুলতে পারবে পানিতে তত বেশি অক্সিজেন দ্রবীভূত হবে। পুকুরের পাড় যত বেশি উঁচু হবে বাতাস পুকুরের পানিকে তত কম আন্দোলিত করবে। পুকুরের পাড় যত বেশি গাছ-পালায় ঢাকা থাকবে বাতাস থেকে তত কম অক্সিজেন পুকুরের পানিতে মিশবে।

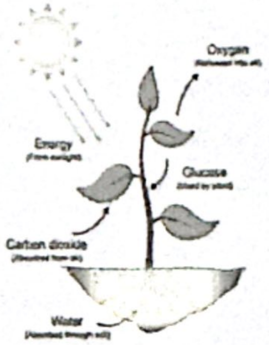

সালোকসংশ্লেষণ: উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির এই পদ্ধতিকে সালোকসংশ্লেষণ বলে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পরিবেশ থেকে পানি নিয়ে গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য ও অক্সিজেন তৈরি করে। গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য নিজের শরীরে নিয়ে নেয় আর অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়।

অক্সিজেন পাই গাছ থেকে
পুষ্টি পাই মাছ থেকে।

পুকুরের পানিতে ক্লোরোফিলধারী জলজ উদ্ভিদ বিশেষ করে ফাইটোপ্লাংকটোন (শ্যাওলা) সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে পানিতে অক্সিজেন তৈরি করে। তাহলে বোঝা গেল পানিতে যদি যথেষ্ট পরিমানে সূর্যালোক না পড়ে এবং পরিমান মত ফাইটোপ্লাংকটন না থাকে তবে পুকুরের পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে

অক্সিজেন তৈরি হবে না। এজন্য আমরা দেখি যেসকল পুকুরে মাছ খাবি খায় (ভাসে) রোদ ওঠার সাথে সাথে মাছ নিচের দিকে নামতে থাকে। কারণ সবুজ শ্যাওলা সূর্যের আলো পেয়ে সালোকসংশ্লেষণ ঘটাতে শুরু করেছে ও পানিতে অক্সিজেন তৈরি শুরু হয়েছে। ফলে মাছ নিচে নামতে থাকে। অর্থাৎ বলতে পারি ফাইটোপ্লাংকটন হলো পুকুরে অক্সিজেনের ফ্যাক্টরি।

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাসের কারণসমূহ-

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাস পাওয়ার জন্য যে সকল কারণ দায়ী সেগুলো হলো-

- **শ্বসন ক্রিয়া:** সকল জলজ জীব যেমন: মাছ, চিংড়ি, ব্যাকটেরিয়া, ফাইটোপ্লাংকটন, জলজ উদ্ভিদ, জুপ্লাংকটন কর্তৃক শ্বসন।
- **পচন ক্রিয়া:** জৈব পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থের পচন।
- **আবহাওয়া:** মেঘলা আবহাওয়ার কারণে পর্যাপ্ত সূর্যের আলোর অভাবে সালোকসংশ্লেষণ না হওয়া।

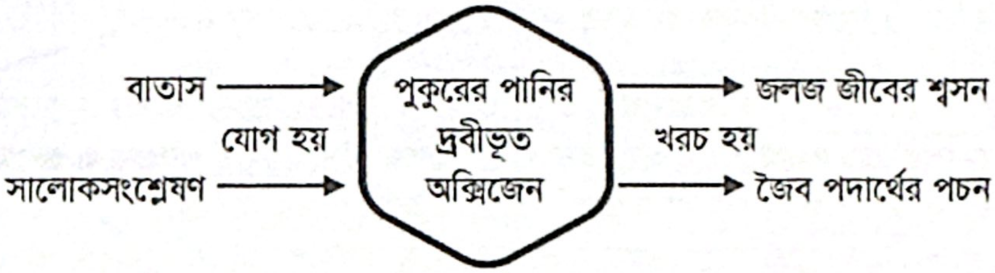

৩) পচন ক্রিয়া

পুকুরের পানিতে এবং পুকুরের তলায় যত বেশি পচন ক্রিয়া ঘটবে। তত বেশি দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাবে। অক্সিজেন কমে গেলে মাছের শ্বসন ক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। পানির পিএইচও কমে যাবে। পানির পিএইচ কমে গেলে মাছের ক্ষুধা মন্দা দেখা দেবে। অক্সিজেন কমে গেল মাছের পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হবে। তাই যত দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাবে মাছের বৃদ্ধি তত কমে যাবে।

অপরদিকে যত বেশি পচন ক্রিয়া ঘটবে তত বেশি মাছের জন্য ক্ষতিকর গ্যাস যেমনঃ অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন মন-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি বেড়ে যাবে। আর যত ক্ষতিকর গ্যাস বেড়ে যাবে পাল্লা দিয়ে পুকুরের পানিতে তত বেশি সমস্যা তৈরি হবে। মাছের জন্যও তা অস্বস্তিকর হবে। মাছ রোগ-বালাই দ্বারা আক্রান্ত হবে। উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যাবে।

পুকুরের পানিতে যে সকল জিনিস পচন ক্রিয়া ঘটায় তাহলো

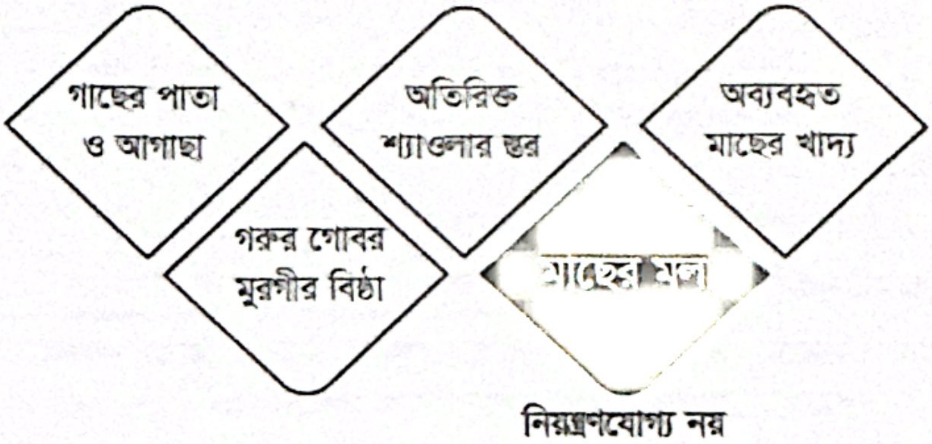

পচন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মাছের মল ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণযোগ্য

পচন ক্রিয়ার ফলে তৈরিকৃত ক্ষতিকর গ্যাস ও তার ক্ষতিকর প্রভাব-

অ্যামোনিয়াঃ পানিতে অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি পানি দূষণের সূচনা করে। পুকুরের তলদেশের জৈব পদার্থ অর্থাৎ অব্যবহৃত খাদ্য, জলজ আগাছা, মৃত শ্যাওলা ও জলজ প্রাণির মলমূত্রের পচন ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। পুকুরে ফাইটোপ্লাংক্টন ব্লুমের পর শ্যাওলার মৃত্যুতে অ্যামোনিয়ার মাত্রা খুব বেড়ে যায়। পকুরে বেশি মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগে অ্যামোনিয়ার মাত্রা বাড়ে। **পানিতে অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.১ পিপিএম এর কম থাকাই বাঞ্ছনীয়।** দেখা গেছে ০.৪৫ পিপিএম মাত্রায় অ্যামোনিয়ার উপস্থিতিতে মাছ ও চিংড়ির বৃদ্ধি প্রায় অর্ধেক কমে যায়। অ্যামোনিয়ার বিষাক্ততার মাত্রা ০.৪-২.০ পিপিএম। এই মাত্রার অ্যামোনিয়ার উপস্থিতিতে মাছ ও চিংড়ির পীড়ন দেখা দেয়। বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এমনকি মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

হাইড্রোজেন সালফাইডঃ পুকুরের তলদেশের জৈব পদার্থ অর্থাৎ অব্যবহৃত খাদ্য, জলজ আগাছ, মৃত শ্যাওলা ও জলজ প্রাণীর মলমূত্রের বায়ুহীন পচন ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি হয়। তলদেশের মাটিতে পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ পাওয়া যায় এবং মাটি কালো বর্ণ ধারণ করে। **পুকুরের পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের কাঙ্খিত মাত্রা ০.০৩ পিপিএম এর কম।** ০.১-০.২ মাত্রার হাইড্রোজেন সালফাইডের উপস্থিতিতে মাছ ও চিংড়ির পীড়ন শুরু হয়, ভারসাম্য হারায় এবং খাদ্য গ্রহন করা থেকে বিরত থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। ০.৪ মাত্রায় মাছ ও চিংড়ি মারা যায়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড: পুকুরের পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন ও পিএইচ এর মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। পানিতে জলজ জীবের শ্বসন ক্রিয়া ও জৈব পদার্থের পচনের কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ে বিপরত দিকে পিএইচ ও অক্সিজেন কমে। আবার সালোক সংশ্লেষণে কার্বন ডাই-অক্সাইড কমে বিপরিত দিকে পিএইচ ও অক্সিজেন বাড়ে।

অর্থাৎ পচন ক্রিয়া যত বাড়বে কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পরিমান তত বাড়বে। মেঘলা আবহাওয়ার সময় বা ব্যাপক হারে ফাইটোপ্লাংকটন মারা যাওয়ার সময় পুকুরে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ব্যাপক বেড়ে যায়।

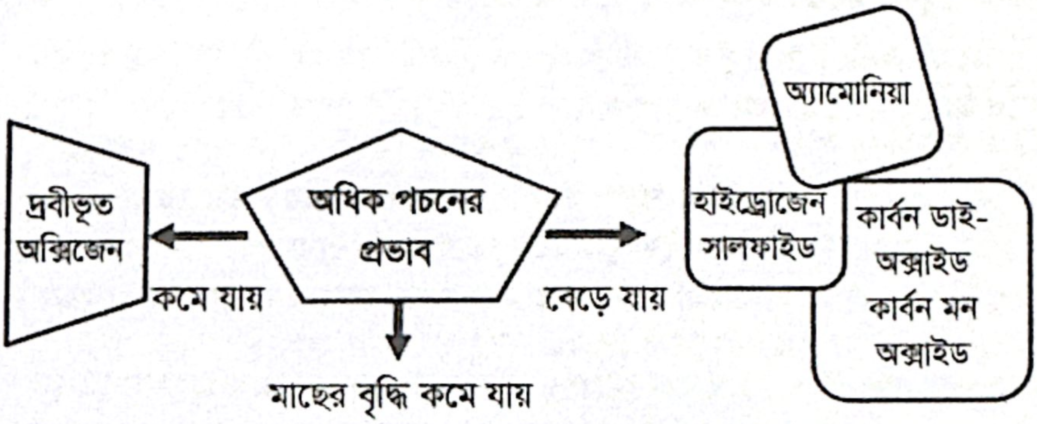

পুকুরের পানিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকতে হবে। কারণ কার্বন ডাই-অক্সাইড না থাকলে শ্যাওলা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারবে না। আবার অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড মাছের জন্য ক্ষতিকর। এতে পিএইচ কমে যায়। মাছের পীড়ন শুরু হয়। মাছের খাদ্য গ্রহন প্রবণতা কমিয়ে দেয়। মাছের বৃদ্ধি বাধা গ্রস্থ হয়। **পুকুরের পানিতে ৫ পিপিএম মাত্রার কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকা ভালো।**

গ্রীষ্মকালীন হঠাৎ মৃত্যু কেন?

গরমের দিনে পুকুরের উপরি-স্তরের পানির তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও পানি হালকা হয়ে যায়। অন্যদিকে তলদেশের পানি ঠান্ডা ও ভারী থাকে। এই অবস্থায় উচ্চ তাপমাত্রার পানি ও কম তাপমাত্রার পানির মধ্যবর্তী অংশে একটি হালকা স্তরীকরণের সৃষ্টি হয়। এতে হালকা পানি ও ভারী পানির মিশ্রণ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে তলদেশের পানিতে সালোকসংশ্লেষণ না হওয়ায় ও বাতাসের সংস্পর্শে আসার সুযোগ কমে যাওয়ায় নিচের স্তরে অক্সিজেন কমে যায়। যদি তলদেশে জমাকৃত বর্জ্য বেশি থাকে তবে তা পচে অক্সিজেন আরও কমিয়ে দেয়। ফলে তলদেশের পানিতে মারাত্মক অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়। সেই সাথে পচনের ফলে তৈরিকৃত ক্ষতিকর গ্যাস এক

CS CamScanner

অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি করে। এ অবস্থায় হঠাৎ ভারী বৃষ্টি হলে উপরিভাগের গরম পানি ঠান্ডা হয়ে তলদেশের পানির সমান তাপমাত্রা ও ঘনত্বে চলে আসে ও তলদেশের কম অক্সিজেন ও ক্ষতিকর গ্যাস সম্পন্ন পানির সাথে মিশ্রণ ঘটে। একে পন্ড-টার্নওভার বলে। এতে নিম্ন অক্সিজেন সম্পন্ন তলদেশের পচা পানি পুকুরের সকল অংশে সমানভাবে মিশে সমস্ত পুকুরে সামগ্রিকভাবে অক্সিজেন কমিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় পুকুরের কোন অংশেই পর্যাপ্ত অক্সিজেন না থাকায় মাছের জন্য নিরাপদ জায়গাই থাকে না। ফলে মাছ ব্যাপক হারে মৃত্যুবরণ করে।

অনেক পুকুরে রাতের প্রথম ভাগ বা মাঝ রাত থেকে মাছ ভাসে কেন?

অক্সিজেনের অভাবে মাছ সাধারণত ভোর বেলা খাবি খায় বা ভাসে। কিন্তু অনেক পুকুরে মাছকে রাতের প্রথম ভাগ বা মাঝ রাত থেকে খাবি খেতে দেখা যায়।

পুকুরের তলদেশে অধিক জৈব পদার্থ থাকলে এক সময় তার পচন ক্রিয়া ঘটতে থাকে। সাথে যদি ফাইটোপ্লাংক্টন ব্লুম হয়। তবে সেই পুকুরে অক্সিজেনের প্রচন্ড অভাব হয় ও মাছ রাতের প্রথম ভাগ ও মাঝ রাত থেকে ভাসতে থাকে।

পানির একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা আছে। যেমনঃ এক গ্লাস পানিতে হয়তো দুই মুঠ চিনি গুলানো যাবে কিন্তু তার অতিরিক্ত দিলে আর গলবে না। তলায় জমা হয়ে থেকে যাবে। তেমনি পুকুরের পানিরও একটি ধারণ ক্ষমতা আছে। সেই ধারণ ক্ষমতা দিয়ে পানি অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস ধরে রাখে।

পুকুরের তলায় জৈব পদার্থের পচনের ফলে অক্সিজেন খরচ হয় ও ক্ষতিকর গ্যাস তৈরি হয়। অর্থাৎ পানির যে অংশে অক্সিজেন ছিল সে জায়গা শুন্য হয় এবং ঐ শুন্য জায়গা ক্ষতিকর গ্যাস দখল করে। যত বেশি পচন হবে; তত বেশি অক্সিজেনের জায়গা সংকোচিত হয়ে পড়বে; তত বেশি জায়গা ক্ষতিকর গ্যাস দখল করবে। বিশেষ করে রাতের বেলা সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ থাকে। পুকুরের পানিতে অক্সিজেন তৈরি হয় না। কিন্তু সকল জলজ জীব শ্বসন ক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহন করে ও পচন ক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন ব্যবহার হয়। এভাবে অক্সিজেন প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। অক্সিজেন পুকুরে পানির যে জায়গা দখল করে ছিল তা প্রায় শূন্য হয়ে যায়। অন্যদিকে পচনের ফলে তৈরিকৃত ক্ষতিকর গ্যাস ঐ শুন্য স্থান দখল করতে থাকে। পরের দিন সূর্য ওঠার সাথে সাথে সালোকসংশ্লেষণ শুরু হয়। অক্সিজেন তৈরি হয়। কিন্তু শুন্য জায়গা অবশিষ্ট না থাকায় অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার সুযোগ পায় না। কেবলমাত্র সালোক সংশ্লেষণের কাজে পানির কার্বন-ডাই অক্সাইড ব্যবহারের

ফলে পুকুরের পানির যে জায়গাটুকু খালি হয় ঐ জায়গাটুকু অক্সিজেন দখল করে। অর্থাৎ অল্প পরিমান অক্সিজেন পানিতে দ্রবিভূত হওয়ার সুযোগ পায়।

এতে সূর্য ডোবার সাথে সাথে অক্সিজেনের ব্যবহার বাড়তে থাকে ও অল্প সময়ের মধ্যে অল্প অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে রাতের প্রথম ভাগ বা মাঝ রাত থেকে মাছ ভাসতে থাকে। অর্থাৎ বোঝা গেল যে পুকুরে যত বেশি পচন ক্রিয়া হয় সে পুকুরের মাছ তত তাড়াতাড়ি ভেসে ওঠে। যেমন: পাট পচা পানির পুকুরে মাছ দিনের বেলায়ও বেসে বেড়ায়।

ধরি, কোন পুকুরের পানির ধারণ ক্ষমতা ১০০। তার মধ্যে অক্সিজেন ৫০ ভাগ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ৪৫ ভাগ, অ্যামোনিয়া ১ ভাগ, অন্যান্য গ্যাস ৪ ভাগ দ্রবীভূত অবস্থায় আছে। ঐ পুকুরে যত জলজ জীব রয়েছে তাদের সূর্য ডোবার পর হতে সূর্য ওঠা পর্যন্ত শ্বসন কার্য পরিচালনার জন্য ৪০ ও জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়ার জন্য ৫ অক্সিজেন প্রয়োজন। অর্থাৎ রাতের বেলা ঐ পুকুরে অক্সিজেন চাহিদা ৪৫। রয়েছে ৫০। তাহলে ঐ পুকুরের মাছ ভোরেও ভাসবে না। কিন্তু যদি পচন ক্রিয়া বেশি হয় তবে অক্সিজেন বেশি খরচ হবে। ধরি, পচন ক্রিয়ার জন্য ১৫ অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। তবে রাতের বেলা শ্বসন ও পচন ক্রিয়ার জন্য ৫৫ ভাগ অক্সিজেন প্রয়োজন হবে। কিন্তু পুকুরে অক্সিজেন রয়েছে ৫০ ভাগ। এক্ষেত্রে ভোরের দিবে মাছ ভাসবে।

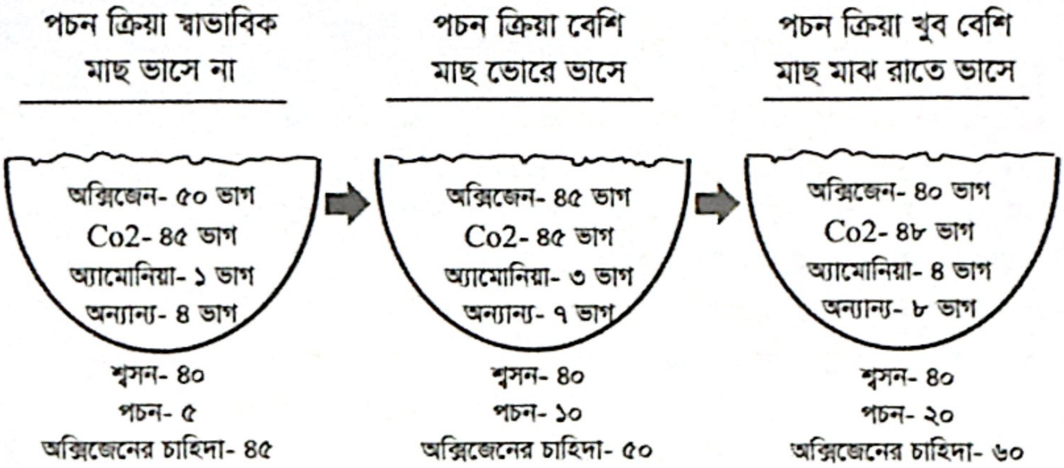
পচন ক্রিয়া স্বাভাবিক
মাছ ভাসে না
পচন ক্রিয়া বেশি
মাছ ভোরে ভাসে
পচন ক্রিয়া খুব বেশি
মাছ মাঝ রাতে ভাসে
অক্সিজেন- ৫০ ভাগ
Co2- ৪৫ ভাগ
অ্যামোনিয়া- ১ ভাগ
অন্যান্য- ৪ ভাগ
শ্বসন- ৪০
পচন- ৫
অক্সিজেনের চাহিদা- ৪৫
অক্সিজেন- ৪৫ ভাগ
Co2- ৪৫ ভাগ
অ্যামোনিয়া- ৩ ভাগ
অন্যান্য- ৭ ভাগ
শ্বসন- ৪০
পচন- ১০
অক্সিজেনের চাহিদা- ৫০
অক্সিজেন- ৪০ ভাগ
Co2- ৪৮ ভাগ
অ্যামোনিয়া- ৪ ভাগ
অন্যান্য- ৮ ভাগ
শ্বসন- ৪০
পচন- ২০
অক্সিজেনের চাহিদা- ৬০

৪) পানির পিএইচ

পানির পিএইচ হলো অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের সূচক। পিএইচ এর পরিমাপের দ্বারা একটি পুকুরের পানি অম্ল না ক্ষার তা জানা যায়। মাছচাষের পুকুরে পিএইচ এর মান ৭.৫-

৮.৫ হওয়া ভালো। পচন ক্রিয়া ও শ্বসন যত বাড়বে কার্বন ডাই-অক্সাইড তত বাড়বে পিএইচ তত কমবে।

মাছের ওপর পিএইচ এর প্রভাব

মৃত্যু ঘটে	বৃদ্ধি হ্রাস পায় কারণ মাছ খাদ্য গ্রহন কমিয়ে দেয়	মাছের খাদ্য গ্রহন ও বৃদ্ধি ভালো থাকে	মাছ খাদ্য গ্রহন কমিয়ে দেয়; বৃদ্ধি হ্রাস পায়	মৃত্যু ঘটে

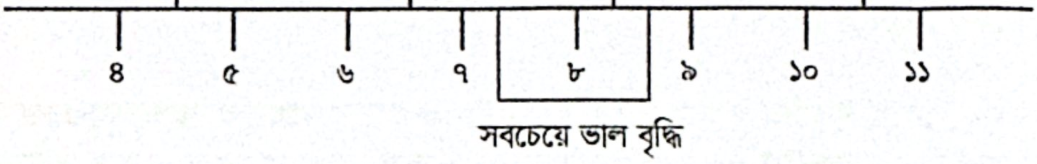

পিএইচ যত কমে মাছের খাদ্য গ্রহন প্রবণতাও তত কমে। সেক্ষেত্রে মাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়।

অম্ল নয় অল্প ক্ষার
তেমন জলেই মাছের বাড়।

এছাড়া মাছের মৃত্যু হার বেড়ে যায়। পিএইচ কমে গেলে মাছের দেহে পিচ্ছিল পদার্থ বেশি হয়। শ্বসন ক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়। এর প্রতিকারে অ্যাকুয়া পণ্য ও রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বাড়াতে হয়। যাতে অতিরিক্ত খরচ হয়। উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।

৫) পরিমাণমত সবুজ শ্যাওলা

শ্বসন ক্রিয়ার জন্য যেমন অক্সিজেন প্রয়োজন তেমনি পেটের খাদ্য পরিপাকের জন্যও অক্সিজেন প্রয়োজন। পুকুরে অনেক খাদ্য প্রয়োগ করা হলেও অক্সিজেন পরিমানমত না থাকলে উৎপাদন ভালো হবে না। এতে সম্পূরক খাদ্যের পিছনে অর্থ ব্যয়ের অনেকটাই মাটি হবে। তাই পুকুরের পানিতে পরিমাণমত দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকতে হবে।

পানির রঙটি চিনতে শেখো
মাছের চেহারায় দৃষ্টি রেখো।

শ্যাওলা হলো পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের ফ্যাক্টরী। আমরা জানি পানিতে দুইভাবে অক্সিজেন আসে। বায়ুমন্ডল ও সবুজ শ্যাওলার সালোকসংশ্লেষণ। তবে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রধান উৎস্য হলো সবুজ শ্যাওলার সালোকসংশ্লেষণ। এ জন্য দেখা যায় পুকুরে মাছ ভাসছে কিন্তু সূর্য ওঠার সাথে সাথে মাছ নিচের দিকে নামতে থাবে। কারণ সবুজ শ্যাওলা সূর্যের আলোর উপস্থিতির কারণে সালোকসংশ্লেষণ শুরু করেছে। পানিতে অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে।

শ্যাওলা শুধু পানিতে অক্সিজেন সরবরাহ করে না। শ্যাওলা মাছের ও জুপ্লাংটনের প্রাকৃতিক খাদ্য।

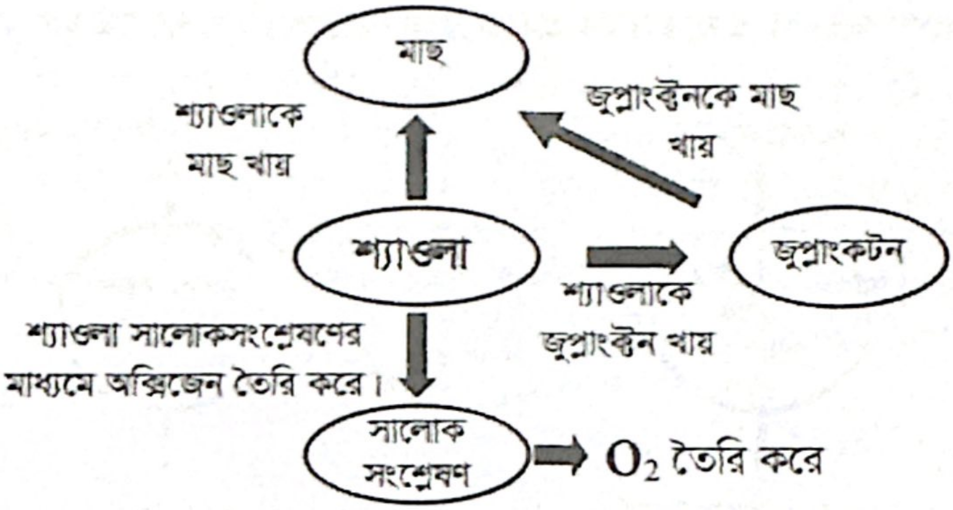
মাছ
শ্যাওলাকে মাছ খায়
জুপ্লাংক্টনকে মাছ খায়
শ্যাওলা
জুপ্লাংকটন
শ্যাওলাকে জুপ্লাংক্টন খায়
শ্যাওলা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করে।
সালোক সংশ্লেষণ
O₂ তৈরি করে

৬) ফাইটোপ্লাংকটন ব্লুম বা শ্যাওলার স্তর

পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিশ্চিত করার জন্য যেমন পরিমাণমত সবুজ শ্যাওলা থাকা প্রয়োজন। তেমনি অতিরিক্ত শ্যাওলার উপস্থিতি মাছের বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর। অতিরিক্ত শ্যাওলার সালোক সংশ্লেষণের ফলে দিনের বেলায় অক্সিজেনের উপস্থিতি বেড়ে যায়। এতে পিএইচও বেড়ে যায়। অপরপক্ষে রাতের বেলায় অতিরিক্ত শ্যাওলার শ্বসন ক্রিয়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমান বেড়ে যায়। এতে পিএইচ কমে যায়। অর্থাৎ মাছের জন্য এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

আমরা অনেকেই মনে করি সবুজ উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে কার্বন শুধু ডাই-অক্সাইড গ্রহন করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। আর আমরা অক্সিজেন গ্রহন করি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। সবুজ উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণের জন্য যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহন করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। তেমনি শ্বসন ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন গ্রহন করে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

আমরা যেমন শ্বসন কার্য পরিচালনা করি। আমাদের পাশাপাশি দু'টি অঙ্গ মুখ ও নাক। মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহন করি ও নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেই। সবুজ উদ্ভিদও তাই। তাদের পাতায় ও শাখা-প্রশাখায় অসংখ্য রন্ধ্র (ছিদ্র) রয়েছে। যার মাধ্যমে শ্বসন কার্য পরিচালনা করে। আমরা খাদ্য গ্রহন করি তিন বেলা কিন্তু নিঃশ্বাস নেই সবসময়।

উদ্ভিদ যতক্ষণ সূর্যের আলো পায় ততক্ষণ খাদ্য তৈরি করে কিন্তু নিঃশ্বাস নেয় সবসময়। এজন্য অতিরিক্ত শ্যাওলার স্তর দিনের বেলা সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে অনেক বেশি অক্সিজেন তৈরি করে। কিন্তু রাতের বেলা শ্বসনের মাধ্যমে অক্সিজেন নিঃশেষ করে দেয় ও প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। যা পানিতে জমা হয়।

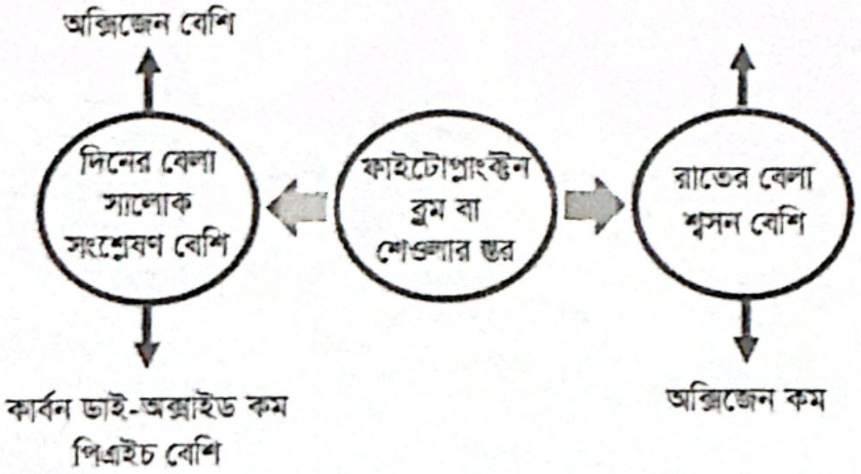
অক্সিজেন বেশি
দিনের বেলা সালোক সংশ্লেষণ বেশি
ফাইটোপ্লাংক্টন ব্লুম বা শেওলার স্তর
রাতের বেলা শ্বসন বেশি
কার্বন ডাই-অক্সাইড কম
পিএইচ বেশি
অক্সিজেন কম

এছাড়া একটি নির্দিষ্ট সময় পর ব্যাপক হারে শ্যাওলা মারা যায়। যা তলদেশে গিয়ে পচন ক্রিয়া ঘটায়। রাতের বেলা অক্সিজেনের ঘাটতি আরও প্রকট আকার ধারণ করে। ব্যাপক পচঁনের ফলে অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসের প্রচুর্যতাও অনেক বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে মাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়। উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।

৭) সুষম সম্পূরক খাদ্য

মাছ পুকুরে ছেড়ে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। বিষয়টি মৎস্য খামারীগণ ভালোভাবেই রপ্ত করতে পেরেছেন। অনেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু অনেকেই এখনও রপ্ত করতে পারেননি যে যেনতেন খাদ্য প্রয়োগ করে লাভ নেই। তাই খাদ্যের উপকরণ হিসেবে তারা কনফেকশনারী কারখানার পরিত্যাক্ত বিস্কুট বা পাউরুটি এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ নিম্নমানের গমের ভূষি, চাউলের কুড়া ও সরিষার খৈল ব্যবহার করেন। এসব উপকরণে খাদ্য উপাদান থাকে না

মাছের খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের সঠিক পরিমান		
☐	আমিষ-	২৮-২১ ভাগ
☐	শর্করা-	৩০-৪০ ভাগ
☐	স্নেহ/তেল-	৭-৪ ভাগ
☐	ফাইবার-	৬-১০ ভাগ

বললেই চলে। মাছের বৃদ্ধিতে এটি তেমন কোন প্রভাব ফেলে না। শুধু টাকা নষ্ট হয়। বরং ক্ষতিকর মাইকোটক্সিন এসব উপকরণে তৈরি হয়। যা মাছের গুণগতমান নষ্ট করে দেয়।

আমরা যা কিছু খাইনা কেন তার মধ্যে ৬ ধরণের খাদ্য উপাদান থাকে। এই খাদ্য উপাদানগুলো হলো- শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ লবন, ভিটামিন ও পানি। এর মধ্যে আমিষ দেহের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করে। আবার ভিটামিন দেহে অল্প পরিমানে প্রয়োজন; কিন্তু ঐটুকু না থাকলে মাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। চর্বি পরিমাণমত না থাকলে মাছের মাংশে স্বাদ আসে না। বিভিন্ন মাছের দেহে আমিষের চাহিদা বিভিন্ন। তাই পুকুরে মাছকে যে খাদ্য প্রয়োগ করা হয় তাতে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান কি পরিমাণে রয়েছে তা জানা আবশ্যক।

৭) তলদেশের পচা কাঁদা

জলজ আগাছা, গাছের পাতা, মৃত সবুজ শ্যাওলা, অতিরিক্ত সার ও খাদ্য, মাছের মল-মূত্র তলায় নিয়মিতভাবে জমা হয় ও কাঁদা তৈরি করে। যা পচে ক্ষতিকর গ্যাস তৈরি করে। দ্রবিভূত অক্সিজেন কমিয়ে দেয়। কোন পুকুরে যদি পচা কাঁদার পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে ঐ পুকুরে মাছ চাষকালীন সময়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা তৈরি হয়। যা নিরাময়ে নিয়মিত ব্যস্ত থাকতে হয়। বিভিন্ন অ্যাকুয়া পণ্য ও রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।

বছর বছর পচা কাঁদা, তুলতে হবে ভাই
নিয়ম মত করব চাষ, যাতে ভাল ফলন পাই।

***

উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা যতখানি এগিয়ে রয়েছি গুণগতমানের ক্ষেত্রে ঠিক ততখানি পিছিয়ে রয়েছি। একসময় শ্লোগান ছিল "খাদ্য চাই, খাদ্য চাই"। কিন্তু আজকের শ্লোগান হলো "নিরাপদ খাদ্য চাই"। বাংলাদেশে চিংড়ি ও মৎস্য রপ্তানী একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। রপ্তানী আয়ের দিক থেকে গার্মেন্টসের পরেই এর স্থান। কিন্তু গুণগতমানের মাছ ও চিংড়ির অভাবে রপ্তানীর ক্ষেত্রে আমরা নানামুখি চাপে রয়েছি। ভবিষ্যতে চিংড়ি ও মাছ রপ্তানী বৃদ্ধির বিরাট সুযোগ রয়েছে। তাই নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনে আমাদের আরও মনোযোগী হতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা (Food Safety) কি?

দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রপ্তানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিকল্প নাই। শস্য বা দানা জাতীয় খাদ্যের পাশাপাশি আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সঠিক সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। **খাদ্য নিরাপত্তা হলো-** খাদ্য উৎপাদন, পরিবহন এবং সংরক্ষণের বিজ্ঞান ভিত্তিক এমন সব উপায় যাতে খাদ্য বাহিত রোগ প্রতিরোধের নিশ্চয়তা থাকে।

নিরাপদ খাদ্য কি?

যে খাদ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদানমুক্ত ও খাদ্য হিসেবে গ্রহনের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং উপযুক্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ। অর্থাৎ যে খাদ্য খেলে মানুষ সুস্থ্য থাকে। কোন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয় না। দেহে কোন প্রকার খারপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

কখন মাছ অনিরাপদ হয়?

খামারে উৎপাদিত পণ্য চাষী থেকে পরবর্তী পর্যায়ে অনেকের হাত ঘুরে ভোক্তার হাতে পৌছে। এর প্রতিটি ধাপে খাদ্য দূষণ ও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। যে সকল ধাপে মাছ অনিরপদ হতে পারে তাহলো-

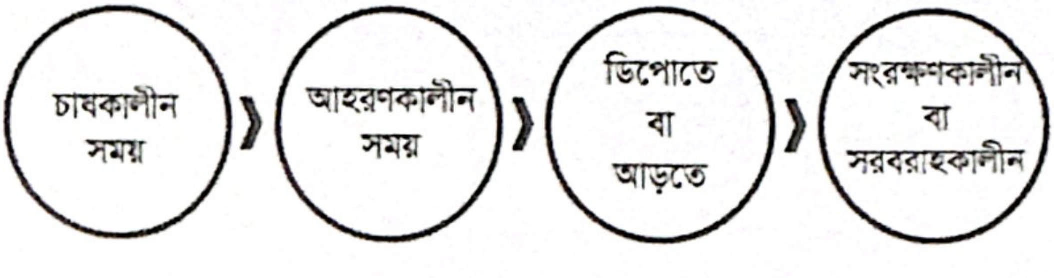

কখন মাছকে অনিরাপদ বলা যায়?

যখন কোন মাছে নিম্নের উপাদনগুলো পাওয়া যায়-

১) ভারী ধাতু ঃ আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, জিংক, কপার, ক্রোমিয়াম, লেড, মারকারী, কোবাল্ট, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি।

২) ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া ঃ স্যালমোনেলা, ভিবরিও, ই-কলাই, লিস্টেরিয়া, শিগেলা, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ইত্যাদি।

৩) ক্ষতিকর ভাইরাস ঃ হেপাটাইটিস-এ এবং হেপাটাইটিস-বি।

৪) এন্টিবায়োটিক ঃ ক্লোরামফেনিকল, নাইট্রোফুরান, সিপ্রোসিন, এজিথ্রোসিন ইত্যাদি।

৫) কীটনাশক ঃ ক্লোরিনেটেড পেষ্টিসাইড যেমনঃ ডিডিটি, এলড্রিন, ডাই এলড্রিন, হেপ্টাক্লোর ও ক্লোরডেন ইত্যাদি।

৬) বিষাক্ত পদার্থ ঃ আলফাটক্সিন, মাইকোটক্সিন।

মাছকে অনিরাপদ করে এমন ক্ষতিকর পদার্থের উৎস

ক্রমিক নং	ক্ষতিকর পদার্থ	যেভাবে মাছের দেহে আসে
১	ভারী ধাতু	১) ট্যানারী , কাগজ কল, টেক্সটাইল মিল ও অন্যান্য কারখানার বর্জ্য। ২) মাছের খাদ্যে এসব কারখানার বর্জ্যের ব্যবহার।
২	ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া	১) পশু ও মানুষের মলমূত্র। ২) হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা।
৩	ক্ষতিকর ভাইরাস	১) মানুষ বা অন্য কোন স্তন্যপায়ী প্রাণির মলমূত্র। ২) দুষিত পানি, মাছি, ইঁদুর, তেলাপোকা, পাখি ইত্যাদি।
৪	এন্টিবায়োটিক	১) এন্টিবায়োটিক ঔষধ। ২) এন্টিবায়োটিক মিশ্রিত খাদ্য।

ক্রমিক নং	ক্ষতিকর পদার্থ	যেভাবে মাছের দেহে আসে
৫	কীটনাশক ও রাসায়নিক	কৃষি জমি, বাগান ও পুকুরে কীট নাশক ও বালাই নাশকের ব্যবহার।
৬	বিষাক্ত পদার্থ	১) নষ্ট ও নিম্নমানের কাঁচা খাদ্য। ২) তলার পচা অতিরিক্ত কাঁদা।

খামারে উৎপাদিত মাছ যে সকল কারণে অনিরাপদ হয়

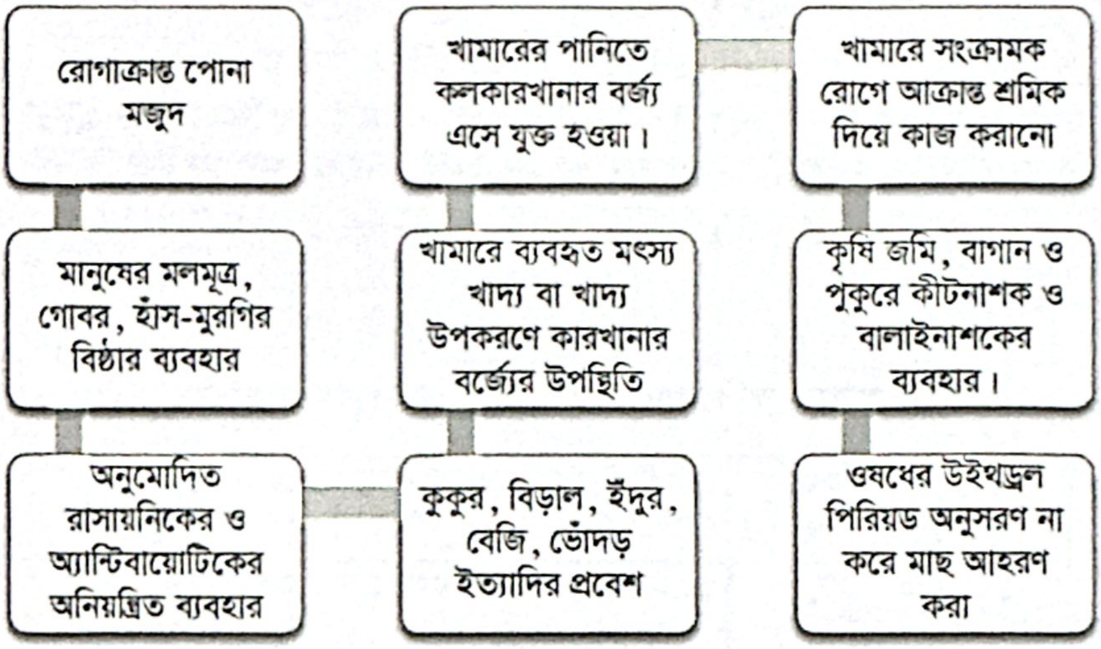
রোগাক্রান্ত পোনা মজুদ
মানুষের মলমূত্র, গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠার ব্যবহার
অনুমোদিত রাসায়নিকের ও অ্যান্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার
কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, বেজি, ভোঁদড় ইত্যাদির প্রবেশ
খামারে ব্যবহৃত মৎস্য খাদ্য বা খাদ্য উপকরণে কারখানার বর্জ্যের উপস্থিতি
খামারের পানিতে কলকারখানার বর্জ্য এসে যুক্ত হওয়া।
খামারে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো
কৃষি জমি, বাগান ও পুকুরে কীটনাশক ও বালাইনাশকের ব্যবহার।
ওষধের উইথড্রল পিরিয়ড অনুসরণ না করে মাছ আহরণ করা

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের সুফল

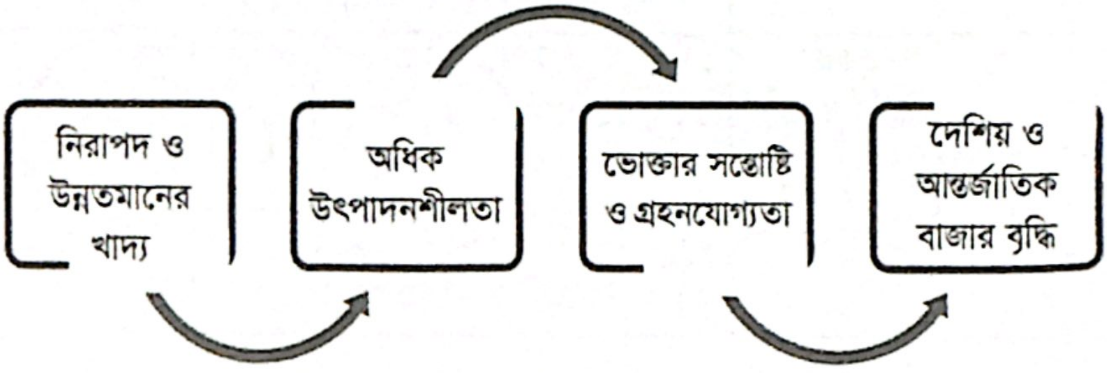
নিরাপদ ও উন্নতমানের খাদ্য
অধিক উৎপাদনশীলতা
ভোক্তার সন্তোষ্টি ও গ্রহনযোগ্যতা
দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বাজার বৃদ্ধি

মাছচাষের মৌলিক বিষয়াবলী

এ পর্যায়ে অল্প খরচে কিভাবে গুণগতমানের মাছ উৎপাদন করা যায় তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব।

মাছ চাষ ও পদ্ধতি

কোন জলাশয়ে মাছের স্বাভাবিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি উৎপাদন পাওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করাকে মাছ চাষ বলে।

একক চাষঃ কোন জলাশয়ে যখন শুধুমাত্র এক প্রজাতির মাছ বা চিংড়ি চাষ করা হয়, তখন এ ধরনের চাষ পদ্ধতিকে একক চাষ বলে। সাধারণতঃ তেলাপিয়া, বাগদা চিংড়ি, মাগুর, থাই পাঙ্গাস, থাই কই ইত্যাদি মাছের একক চাষ করা হয়ে থাকে।

মিশ্রচাষঃ কোন জলাশয়ে যখন একাধিক প্রজাতির মাছ একত্রে চাষ করা হয় তখন এ ধরণের মাছ চাষকে মিশ্রচাষ বলে। পুকুরের সাধারণ ব্যবস্থাপনায় মিশ্রচাষ অধিক লাভজনক। কারণ জলাশয়ের তিনটি স্তরে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক খাদ্য থাকে। আবার বিভিন্ন মাছ ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক খাদ্য খায়। তাই প্রাকৃতিক খাদ্যের সুষ্ঠু ব্যবহারের কথা বিবেচনা করে পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ একত্রে চাষ করা হয়।

মাছচাষের পুকুর

মৌসুমী পুকুরঃ কমপক্ষে ৫ মাস মাছ চাষ উপযোগী পানি থাকে। এ ধরণের পুকুরে তেলাপিয়া, সরপুঁটি, কাতলা, গ্রাসকার্প, চাইনিজ কার্প, গলদা চিংড়ি ইত্যাদি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ চাষ করা লাভজনক।

বাৎসরিক পুকুরঃ সারা বছর মাছ চাষ উপযোগী পানি (কমপক্ষে ৩ ফুট) থাকে। বাৎসরিক পুকুরে সব প্রজাতির মাছ চাষ করা সম্ভব।

একটি আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট

অবস্থান : বাড়ির কাছাকাছি খোলামেলা জায়গায় অথবা শিল্প কারখানার দূষণমুক্ত পরিবেশে হওয়া ভালো।

মাটির ধরণ : বাদামী রংয়ের দো-আঁশ মাটি মাছ চাষের জন্য আদর্শ।

আয়তন : ৩০- ৫০ শতাংশ ও আয়তাকার।

গভীরতা : ৫-৭ ফুট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ঢাল : আদর্শ পুকুরের জন্য ১ঃ১.৫ থেকে ১ঃ২ হওয়া উচিৎ।

পাড় : আগাছা ও ছায়া সৃষ্টিকারী গাছ মুক্ত ও বন্যা মুক্ত।

পানির পিএইচ : ৬.৫-৮.৫ এর মধ্যে হলে তা মাছচাষের জন্য উত্তম।

অক্সিজেন : পানিতে দ্রবিভূত অক্সিজেনের মাত্রা ৪-৫ পিপিএম।

বর্ণ : বাদামী সবুজ বর্ণ অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে।

তাপমাত্রা : রুই জাতীয় মাছচাষে ২৮-৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

প্রস্থে এক দৈর্ঘ্যে দুই; নামলে জলে পায় থই
ঢালু পাড় গভীর নয়; ভাল পুকুর সবাই কয়।

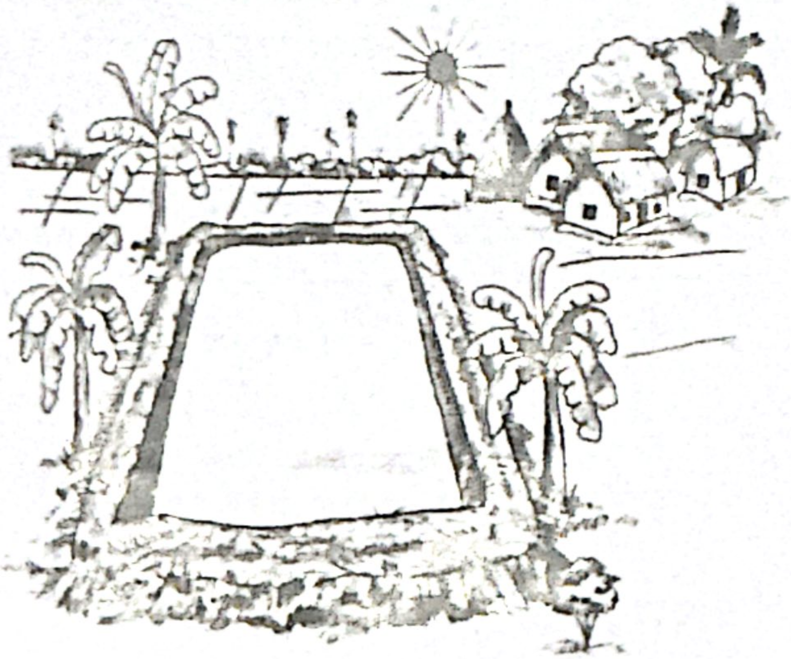

একটি আদর্শ পুকুর

***

অল্প খরচে গুণগতমানের মাছ চাষ কৌশল

মাছ চাষ তিনটি ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ ফসলের জমিতে চারা রোপণের পূর্বে যেমন জমি ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হয়। তারপর চারা লাগাতে হয় এবং চারা লাগানোর পরেও নিয়মিত পরিচর্যা করতে হয়। ঠিক তেমনি পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে পুকুরটি ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হয়। তারপর পোনা ছেড়ে নিয়মিত পরিচর্যা করতে হয়। অর্থাৎ মাছ চাষও তিনটি ধাপে সমপন্ন করতে হয়-

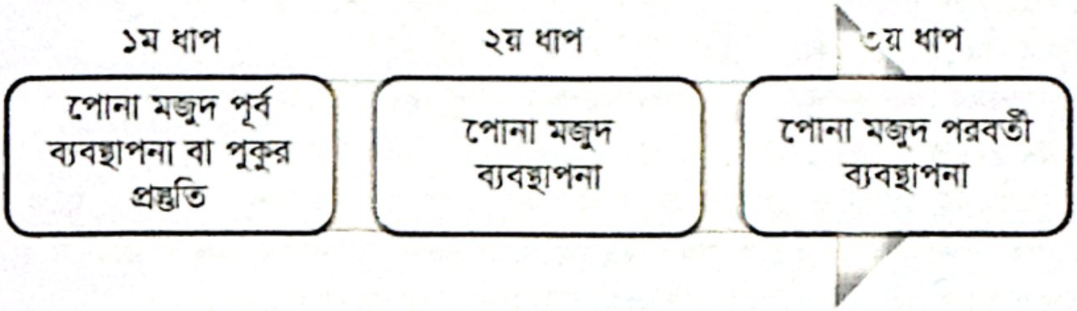
১ম ধাপ
পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা বা পুকুর প্রস্তুতি
২য় ধাপ
পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা
৩য় ধাপ
পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

এখন মাছচাষের তিনটি ধাপ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবো-

১ম ধাপঃ মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা বা পুকুর প্রস্তুতি

মাছচাষে তিনটি ধাপই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে পুকুর প্রস্তুতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভালভাবে পুকুর প্রস্তুত করা গেলে মাছ চাষকালীন সিংহভাগ সমস্যা দূর হয়ে যায়। এতে মাছের খাদ্য ও রাসায়নিক উপকরণ বাবদ খরচ কম হয়। পুকুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিম্নের কাজগুলো ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে হয়-

১। পুকুর সংস্কার

পুকুর সংস্কারের কাজগুলো নিম্নরূপ-

১.১ পাড় মেরামত করা

পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা মেরামত করতে হবে। পুকুরের পাড়ে ইঁদুর বা অন্য কোন প্রাণির গর্ত থাকলে তা ভরাট করতে হবে। কারণ পাড়ে গর্ত থাকলে বাইরের দূষিত পানি ও বাজে মাছ পুকুরে ঢুকে যাবে। এতে পুকুরে নানা রকম সমস্যা তৈরি হবে ও মাছ রোগাক্রান্ত হবে।

১.২ পচা কাঁদা তুলে ফেলা

বছরের পর বছর মাছচাষের ফলে পুকুরের তলায় গাছের লতা-পাতা, আগাছা, মরা শ্যাওলা, ব্যবহৃত সার, মাছের মল-মূত্র, অতিরিক্ত খাদ্য ইত্যাদি তলায় জমা হতে থাকে ও পচতে থাকে। এভাবে আস্তে আস্তে পুকুরের তলায় অনেক পচা কাঁদা জমা হয়। আর বেশি পচা কাঁদা মানেই ক্ষতিকর গ্যাস যেমন: অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন ইত্যাদি বেশি পরিমানে তৈরি হওয়া, অক্সিজেনের স্বল্পতা ও রোগ জীবাণুর আধিক্য। এসব পুকুরে মাছ চাষকালীন মাঝে মধ্যেই নানা সমস্যা তৈরি হয়। মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তাই মাছ আহরণের পর ৩-৪ ইঞ্চি এর অতিরিক্ত পচা কাঁদা তুলে ফেলতে হবে।

তলায় থাকলে পচা কাঁদা;চাষে আসে
নানা বাধা
ওরে ভাই, ওরে দাদা; তুলতে হবে পচা
কাঁদা।

১.৩ তলদেশ শুকানো

পানির পরিবেশ ভালো রাখার জন্য প্রতি ৩-৪ বছর অন্তর অন্তর পুকুর শুকিয়ে অতিরিক্ত পচা কাঁদা তুলে ফেলতে হবে ও রোদে শুকিয়ে তলা ফেটে দিতে হবে। এতে মাটিতে অক্সিজেন মিশ্রিত হবে এবং মাটি দূষণমুক্ত হবে। তবে বেশি কড়কড়ে শুকানো ভাল নয়। এমনভাবে শুকাতে হবে যে মাটিতে ফাঁটল ধরবে অথচ ভেজা থাকবে। একজন মানুষ পুকুরের তলার উপর দিয়ে সহজে হেঁটে যেতে পারে। মাটিতে শুধু পায়ে ছাপ পড়ে কিন্তু পায়ে কাঁদা লাগে না। চাষিরা সাধারণত পুকুর শুকাতে চান না। কারণ তারা মনে করেন; পুকুর শুকাতে বাড়তি টাকা ব্যয় হবে ও এক মাস পুকুর পতিত থাকবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একবার পুকুর শুকালে প্রায় ৩-৪ বছর নির্বিঘ্নে মাছ চাষ করা যায়। উৎপাদন খরচ অনেক কমে যায়।

১.৪ তলা চাষ দেওয়া

পুকুরের তলা চাষ দেওয়ার অভ্যাস খুব ভাল। কেননা তলদেশ রোদে শুকানোর পরও এমন কিছু জায়গা থেকে যেতে পারে যেখানে আলো বাতাস পৌঁছায় না। এসব জায়গায় ক্ষতিকর গ্যাস ও জৈব পদার্থ থেকে যেতে পারে, যা মাছের জন্য খুবই বিষাক্ত। কাজেই তলদেশের মাটির বিষাক্ততা নষ্ট করা বা পরিশোধনের জন্য এবং আলো বাতাসের সংস্পর্শে মাটিকে উর্বর করার জন্য চাষ দেওয়া খুবই জরুরী। চুন প্রয়োগের পর চাষ দেওয়া ভাল। চাষ দেওয়ার পর ৫-৭ দিন তলা শুকিয়ে পানি দিতে হয়।

১.৫ তলা সমান করা ও একদিকে সামান্য ঢালু রাখা

তলা সমান রাখলে হররা টানা ও জাল টানা সহজ হয়। একদিকে সামান্য ঢালু রাখলে মাছ ধরা সহজ হয়। বিশেষ করে শিং ও মাগুর মাছ চাষের ক্ষেত্রে।

২। পর্যাপ্ত সূর্যালোকের ব্যবস্থা করা

মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য পুকুরের পানির তাপমাত্রা ২৮-৩১° সেলসিয়াস থাকা প্রয়োজন। কারণ এই তাপমাত্রায় মাছের পরিপাক ক্রিয়া ভালো হয়। আর পরিপাক ক্রিয়া ভালো হলে মাছের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। তাই পুকুরের পানিতে বাধাহীনভাবে ও বেশি সময় ধরে সূর্যের আলো পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পানিতে রোদের কিরণ
না লাগলে মাছের মরণ;
রোদের কিরণ যেমন পড়ে
মাছের খাবার তেমন বাড়ে।

মাছের পরিপাক ক্রিয়া বাড়লে অক্সিজেনের চাহিদাও বাড়ে। পানিতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন না থাকলে পরিপাক ক্রিয়া বেড়ে লাভ হয় না। সূর্যের আলোর উপর পানিতে অক্সিজেনের পরিমান নির্ভর করে। যত বেশি সময় ধরে পুকুরের পানিতে সূর্যের আলো পড়বে; পানির সবুজ শ্যাওলা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে তত বেশি

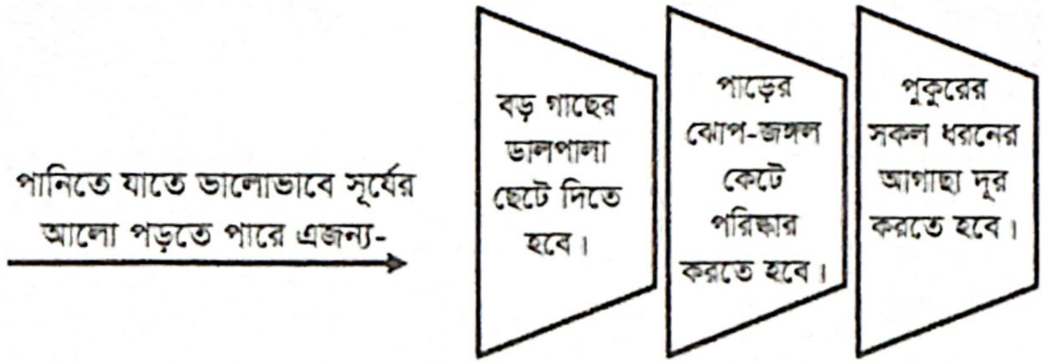
পানিতে যাতে ভালোভাবে সূর্যের আলো পড়তে পারে এজন্য-
বড় গাছের ডালপালা ছেটে দিতে হবে।
পাড়ের ঝোপ-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে হবে।
পুকুরের সকল ধরনের আগাছা দূর করতে হবে।

অক্সিজেন তৈরির সুযোগ পাবে। এজন্য পুকুরের পানিতে দিনে কমপক্ষে ৬-৮ ঘন্টা সূর্যের আলো পড়া প্রয়োজন।

৩। পুকুর খোলা মেলা রাখা

প্রাণির বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অক্সিজেন। পেটের খাবার হজম হওয়ার জন্যও অক্সিজেন প্রয়োজন। পুকুরের পানিতে ৪-৫ পিপিএম মাত্রায় অক্সিজেন থাকলে মাছের হজম ক্রিয়া ভালো হয়। মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অন্যথায় যতই খাদ্য প্রয়োগ করা হোক মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় না। আমরা জানি পুকুরের পানিতে দুইভাবে অক্সিজেন মিশে। প্রথমত: বাতাস থেকে পানিতে অক্সিজেন মিশে। দ্বিতীয়ত: সবুজ শ্যাওলা সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে পানিতে অক্সিজেন তৈরি করে।

বাতাস যত বেশি পানির সংস্পর্শে আসবে; পানিতে যত বেশি ঢেউ তোলার সুযোগ পাবে। সে পানিতে তত বেশি অক্সিজেন মিশবে। এ্যারেটরের কাজ কি? এ্যারেটর পানিকে আন্দোলিত করে বা পানিতে ঢেউ সৃষ্টি করে। যার ফলে পানি বেশি বাতাসের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। তাই পুকুরের পাড় খোলা মেলা, ঝোপ-ঝাড় মুক্ত রাখতে হবে। যাতে একদিকের বাতাসের প্রবাহ পানির উপর দিয়ে বাধাহীনভাবে প্রবাহিত হয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে যায়।

মাছ মরার কমে যাবে ভয়
যদি পুকুরের পানি ভাল হয়।

পুকুরের পাড়ের উচ্চতা ও পুকুরের পানি পৃষ্ঠের উচ্চতার মধ্যে ব্যবধান যত কম হবে বাতাসের প্রবাহ তত বেশি পানির সংস্পর্শে আসতে পারবে। পুকুরের পাড় বেশি উঁচু হলে বাতাসের প্রবাহ ও পানির পৃষ্ঠের মধ্যে একটি পকেট তৈরি হবে। বাতাসের প্রবাহ পানির সংস্পর্শে আসার সুযোগ কম পাবে।

৪। রাক্ষুসে মাছ দূর করা ও অবাঞ্ছিত মাছ কমিয়ে দেওয়া

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ কি?

রাক্ষুসে মাছ-	যে সব মাছ পুকুরে ছাড়া মাছ ধরে খায়। যেমনঃ বোয়াল, শোল, টাকি, বেলে, আইড়, চিতল, ফলি ইত্যাদি।
অবাঞ্ছিত মাছ-	যেসব মাছ পুকুরে ছাড়া মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে। যেমনঃ মলা, ঢেলা, চেলা, পুঁটি, টেংরা ইত্যাদি।

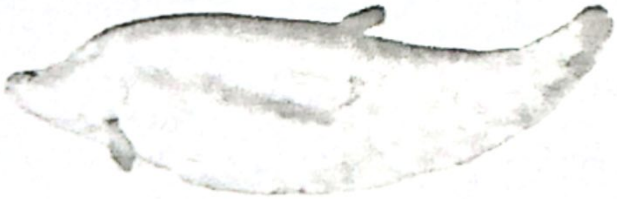

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ কেন সরাবেন ?

- চাষকৃত মাছের পোনা খেয়ে ফেলে।
- খাদ্য, বাসস্থান ও অক্সিজেন নিয়ে চাষকৃত মাছের সাথে প্রতিযোগীতা করে।
- চাষকৃত মাছকে আহত করায় রোগের বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ কিভাবে সরাবেন ?

রাক্ষুসে মাছ থাকলে তা দূর করতে হবে; তবে অবাঞ্ছিত মাছ সম্পূর্ণ নির্মুল না করে যতদূর সম্ভব কমিয়ে দিতে হবে। কারণ এসব মাছ অনেক পুষ্টিকর। প্রতিবার জাল টানার সময় কিছু মাছ উঠবে। যা পরিবারের পুষ্টি যোগাবে। তিনভাবে পুকুরের রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ সরানো যায়।

বারবার ঘন ফাঁসের জাল টেনে। + পুকুর শুকিয়ে। + রোটেনন পাউডার প্রয়োগ করে।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ সরানোর জন্য পুকুর শুকানোই সবচেয়ে ভাল।

নার্সারী পুকুর ব্যতীত শুধুমাত্র দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ মারার জন্য কোন ধরণের বিষ প্রয়োগ বা পুকুর শুকানো উচিত নয়।

রোটেনন পাউডারের প্রয়োগ মাত্রা

প্রয়োগ মাত্রা:
প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির গভীরতার জন্য ৯.১% শক্তির ১৮-২৪ গ্রাম অথবা ৭% শক্তির ২৫-৩০ গ্রাম রোটেনন প্রয়োজন হয়।

পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি: (ফুটের হিসাবে)

পুকুরের যে অংশে পানি আছে তার

$$\frac{(\text{দৈর্ঘ্য}\ X\ \text{প্রস্থ}\ X\ \text{গভীরতা})\ X\ \text{প্রয়োগ মাত্রা (গ্রাম)}}{\text{৪৩৫.৬}} = \text{রোটেননের পরিমাণ (গ্রাম)}$$

প্রয়োগ পদ্ধতি

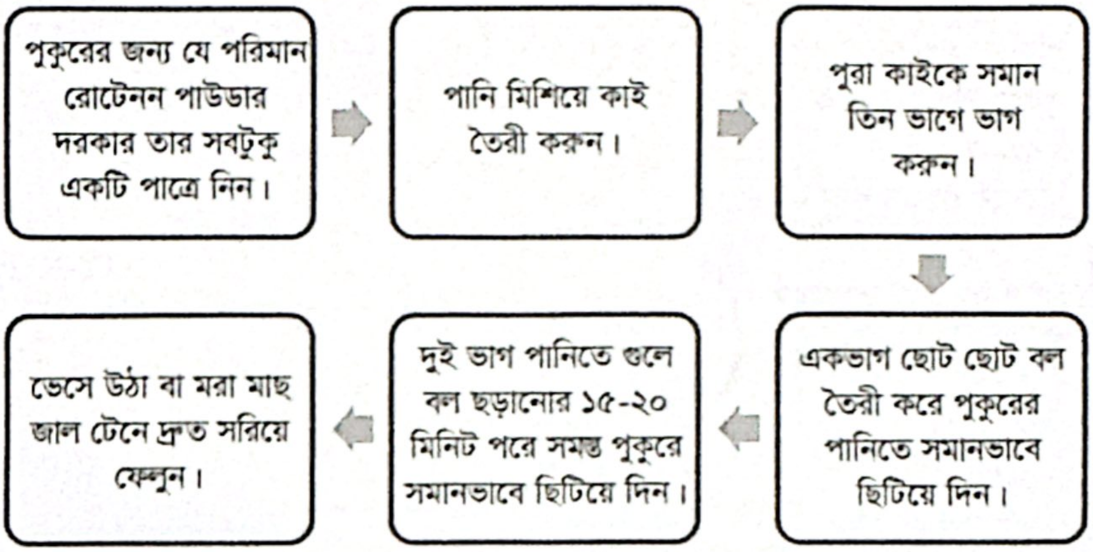

পুকুরের জন্য যে পরিমান রোটেনন পাউডার দরকার তার সবটুকু একটি পাত্রে নিন।

পানি মিশিয়ে কাই তৈরী করুন।

পুরা কাইকে সমান তিন ভাগে ভাগ করুন।

একভাগ ছোট ছোট বল তৈরী করে পুকুরের পানিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন।

দুই ভাগ পানিতে গুলে বল ছড়ানোর ১৫-২০ মিনিট পরে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন।

ভেসে উঠা বা মরা মাছ জাল টেনে দ্রুত সরিয়ে ফেলুন।

প্রয়োগের সময়: রোদের দিনে সকাল ০৯-১০ টায়। রাত, মেঘলা আকাশ বা বৃষ্টির দিনে রোটেনন প্রয়োগ করলে কার্যকারিতা কম হয়।

মনে রাখবেন

- বাতাসের অনুকূলে রোটেনন ছিটাবেন।
- রোটেনন গুলানো ও ছিটানোর সময় হাতে পলেথিন বা গ্লাভস ও নাকে মুখে গামছা বা মাস্ক বেঁধে নিন।
- বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখুন।

৫। চুন প্রয়োগ

মাছচাষের জন্য চুন খুবই প্রয়োজন। পুকুরে আগাছা, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরকরণের ৩-৪ দিন পর চুন প্রয়োগ করতে হয়।

চুন দেওয়ার অশেষ গুণ
সব তরকারীতে যেমন নুন।

চুনের উপকারিতা

- পানির ঘোলত্ব দূর করে।
- সারের কার্যকারিতা বাড়ায়।
- মাটি ও পানির P^H মাছচাষের উপযোগী অবস্থায় রাখে।
- পরজীবী ও রোগ জীবাণূ ধ্বংস করে।
- তলদেশের জৈব পদার্থ পঁচনের মাধ্যমে পুষ্টি উপাদানের সরবরাহ বৃদ্ধি করে।

কি পরিমান চুন দিবেন?

পুকুরে সাধারণত কৃষি চুন ($CaCo_3$) প্রয়োগ করা হয়। যা পাথরে চুন নামেও পরিচিত। পুকুরের অবস্থা বুঝে চুনের মাত্রা কম বা বেশি হয়ে থাকে। যেমন: সাধারণ পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হিসেবে চুন প্রয়োগ করা হয়। পচা বা ঘোলা পুকুরে ১.৫০-২.০০ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি ও সময়?

- পুকুর শুকিয়ে থাকলে শুকানোর ২-৩ দিন পর প্রয়োজনীয় চুন গুড়া করে অথবা গুলিয়ে পাড়সহ সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন প্রয়োগের ২-৩ দিন পর পানি সরবরাহ করতে হয়। অগভীর বা অগভীর নলকূপের পানিই উত্তম কারণ তাতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ বা রোগ জীবাণু পুকুরে প্রবেশ করতে পারে না।
- পুকুরে পানি থাকলে রাক্ষুষে ও অবাঞ্ছিত মাছ নিধনের পর সকালে চুন পানিতে ভিজিয়ে রেখে নরম হলে হালকা গরম অবস্থায় সকাল ৯-১০ টার দিকে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

চুন প্রয়োগে সতর্কতা

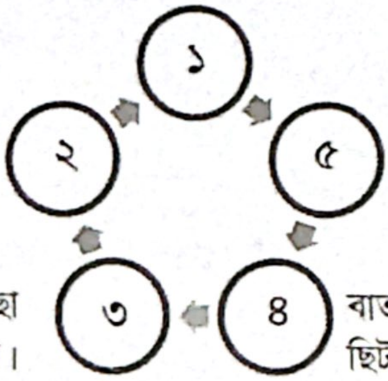

প্লাষ্টিকের পাত্রে চুন গুলানো যাবে না।

পাত্রে পানি দিয়ে, তাতে চুন ঢালতে হবে।

নাক-মুখ মাস্ক বা গামছা দিয়ে বেধে নিতে হবে।

বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।

চোখে চুন লাগলে পরিষ্কার পানি দিয়ে বার বার ধুতে হবে।

৬। সার প্রয়োগ

ছোট কীট ও সবুজ শেওলাই মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য। সার প্রয়োগে এগুলো তৈরি হয়। শিশুর আদর্শ খাদ্য যেমন মায়ের বুকের দুধ। তেমনি মাছের আদর্শ খাদ্য হলো প্রাকৃতিক খাদ্য। প্রাকৃতিক খাদ্যই মাছের রং ও স্বাদের জন্য দায়ী।

বিঘা প্রতি কতটুকু সার দিবেন?

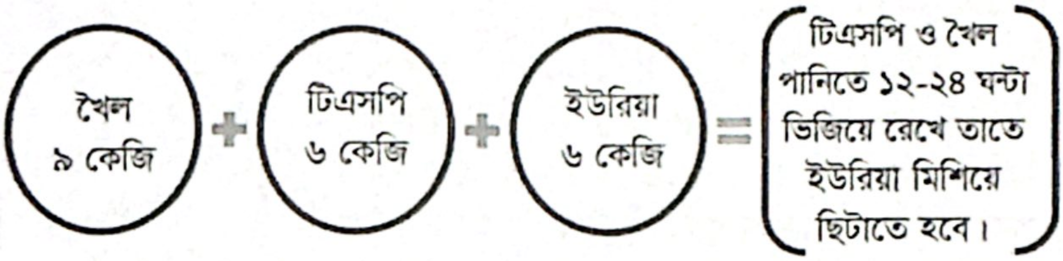
খৈল
৯ কেজি
+
টিএসপি
৬ কেজি
+
ইউরিয়া
৬ কেজি
=
টিএসপি ও খৈল পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তাতে ইউরিয়া মিশিয়ে ছিটাতে হবে।

নিম্নের সারও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে চাষের পুকুরে উকুন কম হয়।

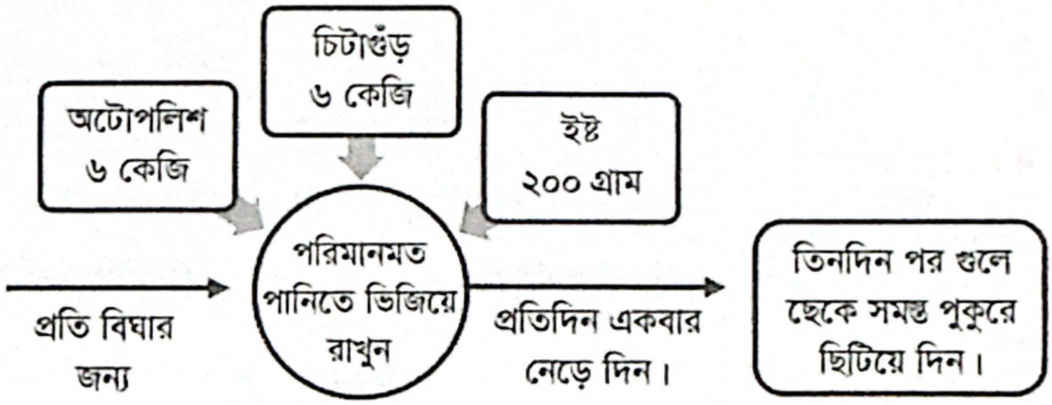
চিটাগুঁড়
৬ কেজি
অটোপলিশ
৬ কেজি
ইষ্ট
২০০ গ্রাম
প্রতি বিঘার জন্য
পরিমানমত পানিতে ভিজিয়ে রাখুন
প্রতিদিন একবার নেড়ে দিন।
তিনদিন পর গুলে ছেকে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিন।

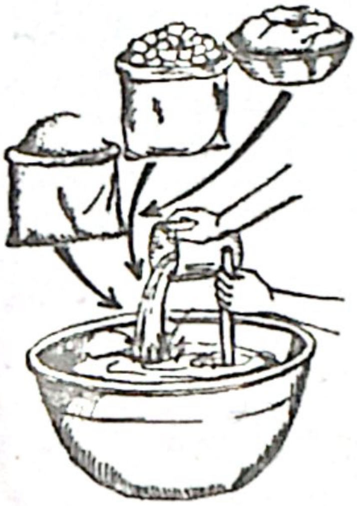

অতিরিক্ত সার প্রয়োগের বিপত্তি

অনেক মৎস্যচাষি বেশি বেশি মাত্রায় সার প্রয়োগ করেন। অতিরিক্ত জৈব সার মানে অতিরিক্ত পচন। আর রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশ, মাছ, মানুষ সকলের জন্যই ক্ষতিকর। তাছাড়া আর্থিক ক্ষতিতো আছেই। অবশ্য তাদের অভিযোগ হলো অল্প সারে পানিতে রং আসে না; আর রং আসলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। পানির একটি রাসায়নিক গুণ হলো হার্ডনেস বা খরতা। খরতার মান ৪০-২০০ পিপিএম

থাকা বাঞ্ছনীয়। খরতা কমে গেলে সেই পুকুরে রং আসে না। রং আসলেও বেশিদিন স্থায়ী হয় না। এজন্য চাষিরা প্রয়োজনের থেকে বেশি সার ব্যবহার করেন। চাষকালীন কোন কারণে যদি পানির খরতা বেড়ে যায়; সেই সময় যদি অতিরিক্ত মাত্রায় সার ব্যবহার করা হয় তবে পুকুরে ফাইটোপ্লাংকটন ব্লুম দেখা দেয়। যা মাছচাষের ঐ সাইকেলে বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই পানির খরচা বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিকার

এক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৮ কেজি চুন ও ২৫ কেজি জিপসাম আলাদা আলাদা পাত্রে ভিজিয়ে রেখে নরম হলে একটি পাত্রে একত্রে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

আগে চুন
পরে সার;
এই কথাটি
ভুল না আর।

সার প্রয়োগের সময়

- চুন প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর।
- রৌদ্রজ্জল দিনে সকাল বেলায় (৯-১০ টায়)।

৭। হররা টানা

হররা কি?

লম্বা রশির সাথে ছোট ছোট ইটের টুকরা অথবা ভারী অন্য কিছু বেঁধে হররা তৈরি করা হয়।

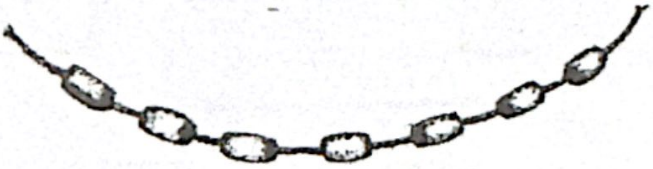

হররা কেন টানবেন?

পুকুরের তলায় অনেক বিষাক্ত গ্যাস জন্মে যা মাছের জন্য ক্ষতিকর। হররা টানলে এ সকল গ্যাস দূর হয়।

কখন টানবেন?

- সার প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর।
- পোনা ছাড়ার আগের দিন।

মনে রাখতে হবে

☐ হররা টানার সময় পুকুরের পানি ঘোলা করা যাবে না।
☐ মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে হররা টানা যাবে না।
☐ সূর্য ওঠার আগে বা খুব ভোরে হররা টানা যাবে না।

৮। চিংড়ির আশ্রয়স্থল নির্মাণ

গলদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে আশ্রয়স্থল নির্মাণের প্রয়োজন হয়। চিংড়ির জুভেনাইলের শারীরিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ভিন্নতর। এরা খোলস বদলানোর মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। খোলস বদলের সময় চিংড়ি খুব দুর্বল থাকে। এ সময় সবল চিংড়ি অর্থাৎ যারা খোলস বদলায় না অথবা অন্য শত্রু এদের খেয়ে ফেলতে পারে। এজন্য আশ্রয়স্থল নির্মাণ করতে হয়। শতাংশ প্রতি ১টি নারিকেল, তাল বা খেজুরের ডাল ৪৫% কোণে গেড়ে দিতে হয়। এছাড়া বাঁশের চোঙ বা প্লাষ্টিকের পাইপও ফেলে দেওয়া যেতে পারে। তাল বা নারিকেলের পাতা কোনাকোনি (৪৫°) পুঁতে দিলে আশ্রয়স্থল হিসেবে বেশী জায়গা পাওয়া যায় এবং পাতাগুলো মাটির উপর থাকলে সহজে পঁচবে না।

৯। কচুরিপানার বেষ্টনী নির্মাণ

শিং ও মাগুর মাছের দেহের স্বাভাবিক রং বজায় রাখার জন্য এটি নির্মাণ করতে হয়। শিং দিনে কিছুটা আধারযুক্ত স্থান পছন্দ করে। আশ্রয়স্থল দিলে দিনে কিছুটা সময় লুকিয়ে থাকতে পারে। জলজ আগাছাপূর্ণ স্থানের অবস্থানের কারণে তার দেহের বর্ণ স্বাভাবিক থাকে। তাই পুকুরের আকার অনুযায়ী কয়েকটি স্থানে কচুরিপানা, কলমি লতা, মালঞ্চ-হেলেঞ্চা ইত্যাদি লতা জাতীয় জলজ উদ্ভিদের বেষ্টনী দিয়ে রাখা যেতে পারে।

১০। পানি প্রবেশ ও নির্গমন পথ নির্মাণ

উত্তম মাছচাষে পুকুরে পানি প্রবেশ ও নির্গমন পথ রাখা ভাল। প্রয়োজনে পানি দেওয়া ও বের করার পৃথক পথ থাকা উচিত। বর্ষা মৌসুমে কখনও কখনও অতি বর্ষণে পানির উচ্চতা বেড়ে যায়। তখন পানি বের করে দেয়ার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পানি দূষনে পুকুরের পানি পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। পুকুরের পাড়ে সুবিধাজনক স্থানে পিভিসি পাইপ বসিয়ে এই কাজটি করা যায়। নির্গমন পথে একাধিক স্ক্রিন (০.৩ মিলি) স্থাপন করতে হবে।

১২। পানির সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা

অক্সিজেনের অভাবে মাছ ভেসে ওঠা বা পুকুরের পানি দূষনে পানি পরিবর্তন করা বা শীতকালে সকালে গরম পানি সরবরাহ করার জন্য পুকুরে পানির উৎস রাখা ভাল। অগভীর বা গভীর নলকূপ সুবিধাজনক জায়গায় স্থাপন করতে হবে। কোন অবস্থাতে পুকুরে খাল-বিল বা ডোবার পানি প্রবেশ করানো যাবে না।

মাছ মরার
কমে যাবে ভয়;
যদি পানি সরবরাহের
ব্যবস্থা ভাল হয়।

১৩। পুকুরে ক্ষতিকর প্রাণি ও কীটপতঙ্গের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ

১৩.১। জাল দিয়ে পুকুর ঢেকে দেওয়া

গুলশা, পাবদা ও শিং চাষ করলে জলচর পাখির উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পাখি নিয়মিতভাবে পুকুরের মাছ খেয়ে শেষ করে ফেলে। বিশেষ করে খাদ্য গ্রহনের সময় যখন পাবদা ও গুলশা উপরে উঠে আসে। এছাড়া শিং প্রায়শই পানিতে উপর-নীচ করতে থাকে। এসমস্ত বণ্য পাখি যে শুধু মাছ খেয়ে শেষ করে তা নয়। এরা পুকুরে রোগ-জীবাণু বহন করে নিয়ে আসে। এতে পুকুরের মাছ রোগ-জীবাণুতে আক্রান্ত হয়। এজন্য পুকুর জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

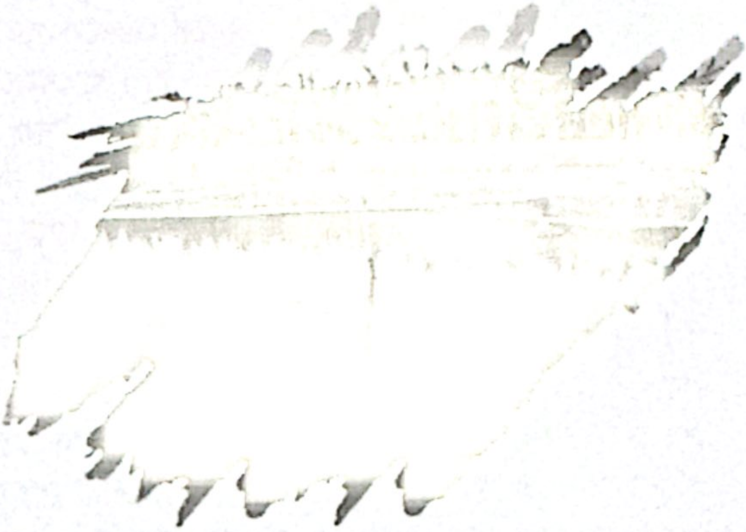

১৩.২। পুকুরের চারিদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ

সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, কুচে, শামুক ও ছাগল-ভেড়ার মাধ্যমে মাছ ও চিংড়িতে রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। তাছাড়া বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় গড়িয়ে আসা পানির মাধ্যমে কৈ, শিং ও মাগুর মাছ পুকুরের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই চাষের পুকুর ঘিরে দেওয়ার অভ্যাস খুব ভাল। বিশেষ করে কৈ, শিং ও মাগুর চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের চারিদিকে প্রায় ৩ ফুট উচু করে বেষ্টনী তৈরি করতে হয়। সাধারণত টিন বা ছোট ফাঁসের নাইলোনের জাল দিয়ে পুকুর ঘিরে দেওয়া যায়। বাঁশের বানা দিয়েও এই কাজটি করা যেতে পারে।

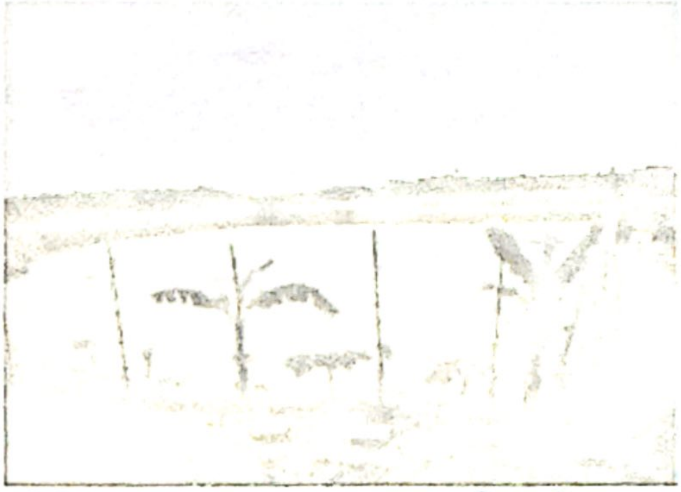

১৪। পুকুরের পানির পরিবেশ ভাল রাখতে বর্জনীয়

পুকুরের পানি দূষণ হলেই মাছ বা চিংড়ি দূষণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল কারণে চাষের পানি দূষিত বা সংক্রমিত হয় তা নিম্নরূপ-

মানুষের মলমূত্র ব্যবহার

মানুষের মলমূত্রে কলেরা, স্যালমোনিলা, সিজেলা, ই. কলি ইত্যাদি ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

নিয়ন্ত্রণের উপায়

- মানুষের মলমূত্র সরাসরি সার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- বাড়ীর পায়খানা ও প্রস্রাবখানার নালা পুকুরের সাথে সংযুক্ত রাখা যাবে না।
- ঝুলন্ত কাঁচা পায়খানা পুকুরের পাশে রাখা যাবে না।
- খামারের শ্রমিক যেন পুকুরের পাড়ে মলমূত্র ত্যাগ না করে তা খেয়াল রাখতে হবে। বৃষ্টির পানিতে এই মলমূত্র খামারের পানিতে চলে যেতে পারে।

জীবজন্তুর মলমূত্র ব্যবহার

জীবজন্তুর মলমূত্রেও কলেরা, স্যালমোনিলা, সিজেলা, ই. কলি ইত্যাদি ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

নিয়ন্ত্রণের উপায়

- গরুর গোবর সরাসরি সার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- গোয়াল ঘরের নালা পুকুরের সাথে সংযুক্ত রাখা যাবে না।
- পুকুরের পাড়ে গৃহপালিত জীবজন্তুর ঘর নির্মাণ করা যাবে না।
- পুকুর পাড়ে গৃহপালিত জীবজন্তু চরানো বা পানিতে গোসল করানো যাবে না।

হাঁস-মুরগির মলমূত্র ব্যবহার

হাঁস-মুরগির চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় হাঁস-মুরগির খাবারেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। এজন্য হাঁস-মুরগির মলমূত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের মেটাবোলাইটস থেকে যায় যা মানুষের দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। অনেক চাষি তাদের পুকুরে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করেন। যা মাছের দেহে যায়। মাছের দেহ থেকে মানুষের দেহে চলে আসে। হাঁস-মুরগির বিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়াও থাকে। যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর।

নিয়ন্ত্রণের উপায়

- পুকুরে কোনভাবেই হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা সার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- পুকুরের পাড়ে বা পানির ওপরে হাঁস-মুরগির ঘর নির্মাণ করা যাবে না।

কীটনাশক ব্যবহার

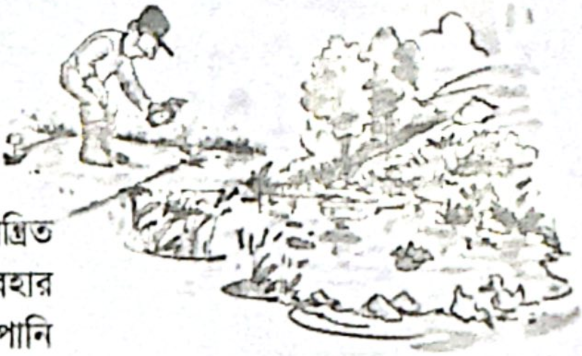

আমাদের দেশে কৃষি জমিতে অনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় কীটনাশক ও বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়। কৃষি জমির গড়িয়ে আসে পানি অনেক পুকুরেই প্রবেশ করে। এছাড়া চাষের পুকুরে পরজীবী বা জলজকীট দূর করতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এতে পুকুরের পানি দূষিত হয়। মাছ অনিরাপদ হয়ে ওঠে।

নিয়ন্ত্রণের উপায়

- কৃষি জমির গড়িয়ে আসা বা চোয়ানো পানি যাতে পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- পুকুরে কীটনাশক ব্যবহার যদি করতেই হয় তবে অবশেষ নিঃশেষ (উইথড্রয়াল পিরিয়ড) অতিবাহিত হওয়ার পর মাছ আহরণ করতে হবে।

রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

লেবেলবিহীন ও অননুমোদিত রাসায়নিকের ব্যবহার মাছচাষে ব্যাপকভাবে চলছে। বিভিন্ন ভুঁইফোড় কোম্পানী এইসব রাসায়নিক দ্রব্য বাজারে ছাড়ছে। এর ফলে চাষের পুকুরের পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। মাছচাষের খরচও বাড়ছে।

নিয়ন্ত্রণের উপায়

- লেবেলবিহীন ও অননুমোদিত রাসায়নিক পদার্থ পুকুরে ব্যবহার করা যাবে না।
- স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তার সাথে বা সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে পরামর্শ করতে হবে।

প্রাকৃতিক দূষিত পানির ব্যবহার

নগর, শিল্প-কারখানা, হাসপাতাল ও ক্লিনিকের বর্জ্য আমাদের প্রাকৃতিক জলাধারের (নদী-নালা, খাল-বিল) পানিকে নানা প্রকারের ক্ষতিকর জীবাণু এবং রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা দূষিত করছে।

নিয়ন্ত্রণের উপায়

- চাষের পুকুরে প্রাকৃতিক উৎসের পানি ব্যবহার করা যাবে না।
- পুকুর পাড়ে সুবিধাজনক স্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে।

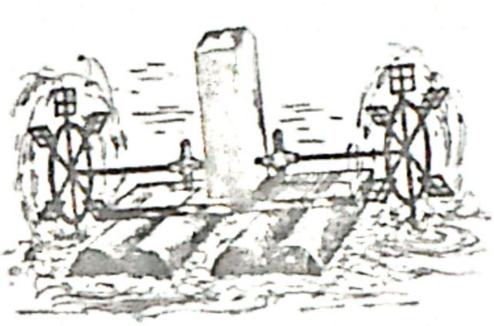

১৫। এ্যারেটর স্থাপন

পুকুরের পানিতে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করতে এ্যারেটর স্থাপন করা যেতে পারে। এতে মাছ নিরাপদ থাকবে ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কম মূল্যের ভেঞ্চুরী এয়ারেটরও ব্যাবহার করা যেতে পারে।

এক নজরে পুকুর প্রস্তুতি

১

পুকুর সংস্কার

- ভাঙ্গা পাড় মেরামত করা।
- পাড়ের গর্ত ভরাট করা।
- ৩-৪ বছর অন্তর পুকুর শুকিয়ে পচা কাঁদা তুলে ফেলা।

২

পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা

পাড়ের বড় গাছের ডালপালা ছেটে দেওয়া। পাড়ের ঝোপ-জঙ্গল দূর করা। আগাছা অপসারণ করা।

৩

পুকুর খোলা-মেলা রাখা

- পাড় নিচু রাখা।
- পাড়ের ডাল-পালা ছাটা।
- অন্তত বিপরীত দুই পার্শ্বের পাড় পরিষ্কার রাখা।

৪

রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূর করা

- পুকুর শুকিয়ে।
- ঘন ফাঁসের জাল টেনে।
- শতাংশ প্রতি ১ ফুট পানির জন্য ৩০ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করে।

৫

চুন প্রয়োগ: রোটেনন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর

- শতাংশ প্রতি ১-১.৫ কেজি।
- সকালে ভিজিয়ে রেখে ৯-১০ টার দিকে তরল ও ঠান্ডা করে সমস্ত পুকুরে ছিটানো।

৬

সার প্রয়োগ: চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর

- খৈল- ৩০০ গ্রাম, ইউরিয়া- ২০০ গ্রাম ও টিএসপি ২০০ গ্রাম।
- আগের দিন টিএসপি+ খৈল ভিজিয়ে রেখে পরের দিন ইউরিয়া মিশিয়ে প্রয়োগ।

পোনা ছাড়ার আগের দিন পুকুরে হররা টানা।

***

দ্বিতীয় ধাপ: পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা

পুকুর প্রস্তুত হয়ে গেলে যত দ্রুত সম্ভব মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। পোনা মজুদকালীন সময়ে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তা হলো-

১। পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

বিষক্রিয়া পরীক্ষা পদ্ধতি

পোনা মজুদ করার ১-২ দিন পূর্বে একটি পাত্র নিয়ে অথবা পুকুরের পানিতে হাফা স্থাপন করে কিছু সংখ্যক সুস্থ/সবল পোনা ছেড়ে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি অধিকাংশ পোনা (৭০%) সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে তবে বুঝতে হবে পুকুরের পানি পোনা ছাড়ার উপযোগী। মাছের পোনার আচরণ অস্বাভাবিক বা মৃত্যুহার বেশি হলে পুকুরে পোনা ছাড়া যাবে না।

বিষাক্ততা থাকলে যা করতে হবে-

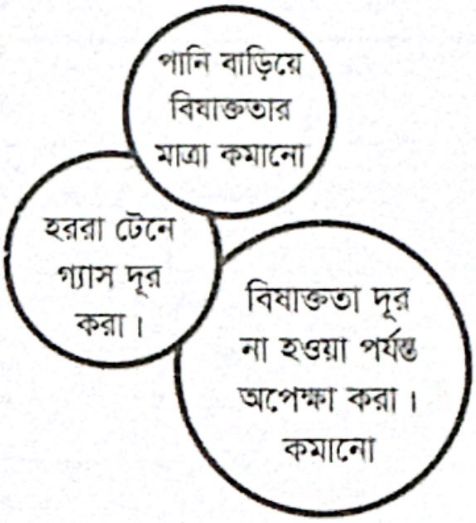
পানি বাড়িয়ে বিষাক্ততার মাত্রা কমানো
হররা টেনে গ্যাস দূর করা।
বিষাক্ততা দূর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। কমানো

২। সুস্থ্য পোনা ছাড়া

সবল পোনা বেশী মাছ উৎপাদন, লাভ বেশী। তাই পোনা কেনার সময় বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে-

যেভাবে সুস্থ্য পোনা চেনা যায়

দেখার বিষয়	ভাল পোনা	খারাপ পোনা
দেহের রং	ঝকঝকে উজ্জল	ফ্যাকাসে বিবর্ণ
আঁইশ	পিচ্ছিল	খসখসে
দেহ, পাখনা, ফুলকা	দাগ থাকে না	লাল দাগ থাকে
শরীরে গঠন	স্বাভাবিক	অস্বাভাবিক
আচরণ	চঞ্চল	স্থির
বিজল	বেশী	খসখসে

এছাড়াও একটি পাত্রে বা বালতিতে পানি নিতে হবে। পাত্র বা বালতির পানিতে হাত দ্বারা স্রোত সৃষ্টি করে কয়টা পোনা ছেড়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সুস্থ পোনা স্রোতের বিপরীতে সাতার কাটবে এবং সহজে ধরা দেবে না।

৩। পোনার মজুদ ঘনত্ব

লাভজনক মাছচাষের জন্য মাছের প্রজাতি ও মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শতাংশ প্রতি বিভিন্ন ধরণের চাষ পদ্ধতির মজুদ ঘনত্ব উল্লেখ করা হলো-

কার্প মিশ্রচাষ	সিলভার কার্প- ৩ কাতলা- ১ রুই- ৫ মৃগেল- ৪ কমন কার্প- ১ গ্রাস কার্প ০-১ সরপুঁটি- ৫	সাথী ফসল হিসেবে শিং অথবা মাগুর অথবা পাবদা অথবা গুলশা অথবা গলদা চিংড়ির পোনা বিঘা প্রতি ৭০০টি ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। এদের জন্য তেমন বাড়তি খাদ্য প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। বরং বছর শেষে বাড়তি ফসল পাওয়া যায়। পানির গুণাগুন ঠিক রাখতেও সহায়ক হয়।
কার্প-তেলাপিয়া মিশ্রচাষ	তেলাপিয়া- ১৫০ কাতলা- ২ রুই- ৬	৩-৪ মাস পর তেলাপিয়া ৩-৪টিতে কেজি হলে ১/৩ ভাগ বিক্রি করে দিতে হবে। কয়েক মাস পর তেলাপিয়া ২টি কেজি হলে ২/৩ ভাগ বিক্রি করে দিতে হবে। অবশিষ্ট প্রতিটি ১ কেজি হলে সব মাছ বিক্রি করতে হবে।
কার্প- শিং, পাবদা, গুলসা মিশ্রচাষ	পাবদা- ৬০০ শিং/গুলশা- ৪০০ কাতলা- ১ রুই- ৪ মৃগেল- ১ তেলাপিয়া- ২০	চাষের সময় ৬-৭ মাস। এসময়ে রুই জাতীয় মাছ ১.৫-২ কেজি এবং তেলাপিয়া ১ কেজির উপরে হবে। এই পদ্ধতিতে চাষ যথেষ্ট লাভজনক। উদ্ভূত সমস্যা কম হয়। কোন কারণে একটি প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্থ হলে অন্য প্রজাতিতে লাভসহ বিনিয়োগ উঠে আসে।
পাঙ্গাস-শিং মিশ্রচাষ	পাঙ্গাস- ৭০ তেলাপিয়া- ৭০ শিং- ৫০০ কাতলা- ১, রুই- ৪, মৃগেল- ৩	শিং মাছ সেচে ধরতে হয়। তাই যে পুকুর সেচ দেওয়া যাবে কেবল সে পুকুরে এই পদ্ধতিতে চাষ করা যাবে। অন্যথায় পাঙ্গাস- ১০০টি, তেলাপিয়া- ১০০টি ও উল্লেখিত রুই জাতীয় মাছ ছাড়তে হবে।

৪। বড় আকারের পোনা ছাড়া

ছোট পোনার মৃত্যুহার বেশী। পরিমানমত পোনা ছাড়া যায় না। ছোট পোনা তাড়াতাড়ি বাড়ে না।

কি আকারের পোনা ছাড়বেন?

রুই জাতীয় মাছ ২৫০-৫০০ গ্রাম ওজনের হলে ভালো হয়।

৫। পোনা শোধন করে ছাড়া

শোধন করে পোনা ছাড়লে পোনার রোগ-বালাই এর সম্ভাবনা কম থাকে । পোনা সুস্থ থাকে।

কিভাবে করবেন?

একটি পাত্রে ১০ লিটার পানি নিন।

তাতে ৩ মুঠো লবন বা ১ চা চামচ ডাক্তারী পটাশ মিশান।

বালতির ওপর একটি ঘন জাল রাখুন। (মাছ তোলার সুবিধার্থে)

প্রতি বারে পরিমানমত পোনা ছেড়ে ১ মিনিট গোসল করান।

বালতির একই পানিতে ৪ বার পোনা শোধন করা যাবে।

৬। পোনা টেকসইকরণ ও ছাড়া

পোনা টেকসই করে ছাড়লে পুকুরে পোনার বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি পায়।

কিভাবে করবেন?

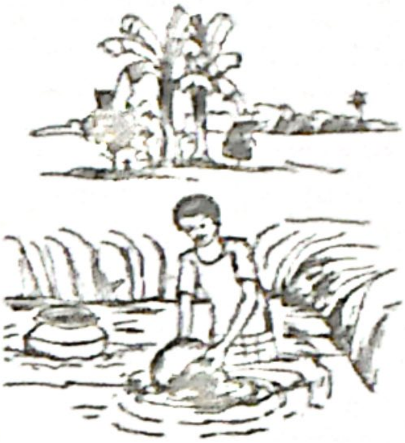

- পোনার পাত্রটি পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখুন।
- পাত্রের কিছু পানি পুকুরে ফেলে দিয়ে পুকুরের কিছু পানি পাত্রে নিয়ে পাত্র ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান করার চেষ্টা করুন।
- পোনার পাত্রের পানি ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা কাছাকাছি হলে পাত্র কাত করে ধরুন।

পোনা ছাড়ার সময়

সকালে বা বিকেলে যখন পুকুরের পানি ঠান্ডা থাকে। কড়া রোদে ও বৃষ্টির মধ্যে পোনা ছাড়বেন না।

পোনা ছাড়ার স্থান

পাড়ের কাছাকাছি পোনা ছাড়ুন।

এক নজরে পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা

বিষ ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

পানা মজুদের ১-২ দিন পূর্বে পুকুরের পানিতে হাফা স্থাপন করে কিছু সংখ্যক পোনা ছেড়ে ১২ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করুন। অধিকাংশ পোনা (৭০%) সুস্থভাবে বেঁচে থাকলে পোনা ছাড়ার উপযোগী।

সুস্থ্য পোনা ছাড়া

সবল পোনা বেশী উৎপাদন, লাভ বেশী।

সুস্থ্য পোনা স্রোতের বিপরীতে সাতার কাটে।

মজুদ ঘনত্ব: প্রতি বিঘায়

সিলভার কার্প-	১০০ টি
কাতলা/বিগহেড-	৩০ টি
রুই-	১৫০ টি
মৃগেল-	১২০ টি
কার্পিও-	৩০ টি
গ্রাস কার্প-	১০ টি

পোনা টেকসই করে ছাড়া

পোনার পাত্রটি পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখুন। পাত্রের কিছু পানি পুকুরে ফেলে দিয়ে পুকুরের কিছু পানি পাত্রে নিয়ে পাত্র ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান করে পোনা ছাড়ুন।

বড় আকারের পোনা ছাড়া

ছোট পোনার মৃত্যুহার বেশী। ছোট পোনা তাড়াতাড়ি বাড়ে না।

রুই জাতীয় মাছ কমপক্ষে ২৫০-৫০০ গ্রাম ওজনের।

পোনা শোধন করে ছাড়া

একটি পাত্রে ১০ লিটার পানি নিয়ে তাতে ৩ মুঠো লবন বা ১ চা চামচ ডাক্তারী পটাশ মিশান। বালতির উপর একটি ঘন জাল রাখুন। পোনা ছেড়ে ১ মিনিট গোসল করান।

সাথী ফসল হিসেবে-

কার্পের সাথে পাবদা/গুলশা/শিং/মাগুর/গলদা চিংড়ি বিঘা প্রতি ১৫০০টি ছাড়ুন।

***

তৃতীয় ধাপ: পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদের পর যেসব কাজ করতে হয় তাহলো-

১। পোনা বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ

নানা কারণে পোনা মারা যেতে পারে। পুকুরে পোনা টিকলো কিনা তা দেখা।

কিভাবে দেখবেন?

পোনা ছাড়ার পরের দিন সকালে পাড়ের কাছে মরা পোনা আছে কিনা দেখতে হবে। পোনার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মরা পোনা গুণে সমপরিমান পোনা আবার ছাড়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। নিয়মিত সার প্রয়োগ

মাছের পোনা মজুদের পর পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য পুকুরে নিয়মিত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। প্রতি ৭-১০ দিন অন্তর প্রতি বিঘা প্রতি নিচের মাত্রায় সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারের নাম	প্রতি বিঘায় পরিমান	বিকল্প সারের নাম	প্রতি বিঘায় পরিমাণ
খৈল	৫ কেজি	চিটাগুঁড়	৩ কেজি
ইউরিয়া	৩ কেজি	অটোপলিশ	৩ কেজি
টিএসপি	৩ কেজি	ইষ্ট	২০০ গ্রাম

সতর্কতা

পুকুরের প্যানি অত্যধিক সবুজ হয়ে গেলে বা উপরে সবুজ স্তর পড়ে গেলে সার প্রয়োগ সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে। পরবর্তীতে পুকুরের পানিতে খাদ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনে সার দিতে হবে।

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

এ কাজটি কয়েকটি পদ্ধতিতে করা যায়; যেমন-

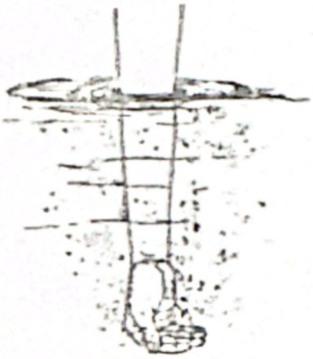

ক. হাত দিয়ে পরীক্ষা

দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে পুকুরের পানিতে নেমে হাত কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখতে পাওয়া না যায় তাহলে বুঝতে হবে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য পুকুরের পানিতে রয়েছে। আর যদি হাতের তালু দেখা যায় তবে বুঝতে হবে প্রয়োজনীয় খাবার নেই।

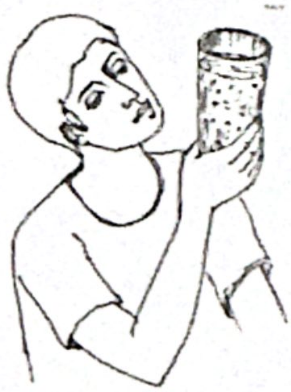

খ. স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস দ্বারা

একটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে পুকুরের পানি নিয়ে তা আলোর দিকে ধরলে পানির রং সবুজ অথবা বাদামী দেখা যাবে। তাছাড়া গ্লাসের পানিতে অসংখ্য ছোট ছোট সুজির দানার মত পোকার মতো দেখা যায়, এ কণাগুলো প্রাণীকণা ।

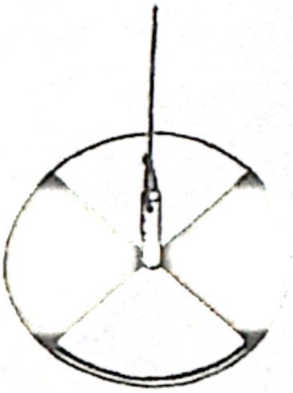

গ. সেক্কী ডিক্স দিয়ে পরীক্ষা

সেক্কি ডিস্ক হচ্ছে টিনের বা লোহার একটি সাদা কালো রংয়ের গোলাকার চাকতি যার ব্যাস ২০ সেঃমিঃ। চাকতিটি সুতা দিয়ে ঝুলানো থাকে। পুকুরের পানিতে ডুবানো হলে যদি ২৫-৩৫ সেঃমিঃ গভীরতায় চাকতি দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পানিতে ভাল খাবার আছে। ৩৫ সেঃমিঃ এর বেশী গভীরতায় দেখা গেলে বুঝতে হবে খাদ্য খুব কম আছে।

৩। নিয়মিত সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ

মাছের পুকুরে উৎপাদিত ছোট ছোট সবুজ শেওলা ও কীটই মাছের প্রকৃত খাদ্য। অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য বাইরে থেকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাই সম্পুরক খাদ্য। যেমনঃ চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, সরিষার খৈল ইত্যাদি। গ্রাস কার্প ছাড়লে সবুজ নরম ঘাস বা লতা-পাতা পুকুরে খাদ্য হিসেবে দিতে হবে।

সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপাদান

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ একসাথে মিশিয়ে উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়। ১ কেজি খাবার তৈরি করতে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার মাত্রা নিম্নরূপ-

উপকরণ	কার্প মিশ্রচাষ ও কার্প-তেলাপিয়া		কার্প-শিং/ কার্প-গুলশা/ কার্প-গলদা
	মডেল- ১	মডেল- ২	
চালের কুড়া বা ভুট্টার ভূষি	৫০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম
ফিসমিল	১০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
সরিষার খৈল	৩০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৪৫০ গ্রাম
আটা	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
ভিটামিন	৫ গ্রাম	৫ গ্রাম	৫ গ্রাম
লবন	৫ গ্রাম	৫ গ্রাম	৫ গ্রাম
মোট	১০০০ গ্রাম	১০০০ গ্রাম	১০০০ গ্রাম

সম্পূরক খাদ্য তৈরির পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় খৈল ২৪ ঘন্টা পূর্বে দ্বিগুণ পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।

অন্যান্য উপকরণ একটি পাত্রে নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

আটা পরিমাণমত পানিতে ফুটিয়ে আঠালো করুন।

আটা দ্বারা সব উপকরণগুলো মেখে কাঁই বানিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করুন।

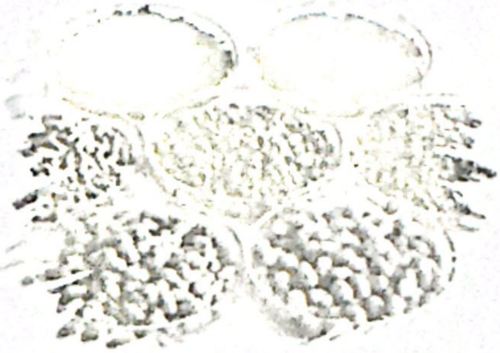

তেলাপিয়ার খাদ্য কোম্পানীজাত ভাসমান খাবার ভালো হয়।

শিং মাছের জন্য দানাদার খাদ্য ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা

মোট মাছের ওজনের ৩-২ ভাগ হিসেবে।	মোট মাছের ওজনের ৮-৫ ভাগ হিসেবে।	মোট মাছের ওজনের ৪-৩ ভাগ হিসেবে।	মোট মাছের ওজনের ১০-৮ ভাগ হিসেবে।
কার্প জাতীয় মাছ	মনোসেক্স তেলাপিয়া	শিং, মাগুর পাবদা	পাঙ্গাস

পোনা অবস্থায় মাছের খাদ্য চাহিদা বেশি থাকে। এ সময় কার্প জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে মাছের মোট ওজনের ৩ ভাগ হিসেবে খাদ্য দিতে হবে। বড় হবার সাথে সাথে মাছের খাদ্য চাহিদা কমতে থাকে। তখন খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা ধীরে ধীরে কমিয়ে শতকরা ২ ভাগে নিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রে একইভাবে বেশি থেকে কম মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

নমুনায়নের মাধ্যমে সম্পুরক খাদ্যের পরিমান নির্ধারণ

মনে করা যাক একটি তিন বিঘা আয়তনের পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির ২০০০ পোনা মজুদ করা হয়েছে। এই অনুপাতে কাতলা ৬০ টি, সিলভার কার্প ২০০ টি, রুই ৩০০ টি, গ্রাসকার্প ৩০ টি, মৃগেল ২৬০ টি ও কমন কার্প ৬০ টি। মাছ ছাড়ার সময় প্রতিটি প্রজাতির মাছের শতকরা ৫-১০ টির ওজন নিয়ে পুকুরে মজুত করা মাছের মোট ওজন নির্ধারণ করা হলো। ধরা যাক, গ্রাস কার্প ছাড়া এই ওজন ৪০০ কেজি। মাছের দেহ ওজনের শতকরা ২.৫% হিসেবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং ৪০০ কেজি মাছকে ২.৫% হিসেবে দৈনিক ১০ কেজি সম্পূরক খাদ্য দেয়া শুরু করতে হবে।

এক মাস পর পুকুরে জাল টেনে আগের মত প্রতিটি প্রজাতির শতকরা ৫-১০টি মাছের ওজন নিয়ে তা থেকে মোট মাছের ওজন নির্ধারণ করতে হবে। ধরা যাক, এবার মোট ওজন ৬০০ কেজি। অর্থাৎ ৬০০ কেজির শতকরা ২% হিসেবে এখন দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ হবে ১২ কেজি।

সহজভাবে সম্পূরক খাদ্যের পরিমান নির্ধারণ

কার্পের মিশ্রচাষ

প্রতি মাসে প্রতি শতাংশে

১ম মাসে :	৫০ গ্রাম
২য় মাসে :	৯০ গ্রাম
৩য় মাসে :	১৭০ গ্রাম
৪র্থ মাসে :	২১৫ গ্রাম
৫ম মাসে :	২৫০ গ্রাম
৬ষ্ট মাসে :	৩০০ গ্রাম

খাদ্য সমান দুইভাগ করে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

কার্প-তেলাপিয়া

বয়স অনুযায়ী খাদ্য প্রয়োগ হার

১০ গ্রাম পর্যন্ত-	৩০%
২০ গ্রাম পর্যন্ত-	১৫%
৩০ গ্রাম পর্যন্ত-	১০%

৫০ গ্রাম বা উপরের-৫%

ছোট মাছকে দৈনিক ৪ বার খাদ্য দিতে হবে। বড় মাছকে সকাল ৯-১০ টার দিকে ও বিকাল ৪-৫ টার দিকে খাদ্য দিতে হবে।

কার্প-শিং, কার্প-পাবদা/গুলশা, কার্প-গলদা

বয়স অনুযায়ী খাদ্য প্রয়োগ হার

১ মাস বয়স	: ১০-৮%
২-৩ মাস বয়স	: ৮-৭%
৪ মাস বয়স থেকে আহরণ পর্যন্ত	: ৫-৩%

এসব মাছচাষে সাধারণতঃ দানাদার খাদ্য ব্যবহার করা হয়। খাদ্য দিনে দুইবার প্রয়োগ করতে হয়। সকাল ১০-১১ টার দিকে এবং সুর্যাস্তের পর।

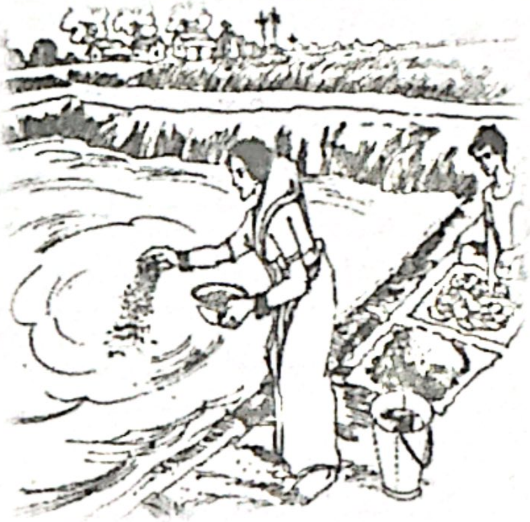

কাপ-শিং/কার্প-পাবদা (গুলশা)/কৈ মাছচাষে বানিজ্যিক খাদ্য প্রয়োগ হার

পোনা মজুদের পর মাছের মোট ওজনের ১৫-১০% হারে খাদ্য প্রয়োগ শুরু করে এক মাসের মধ্যে তা ৫% এ নামিয়ে আনা যেতে পারে। পোনা বড় হলে আরও কম হারে খাদ্য প্রযোগ শুরু করা যেতে পারে। এরপর মাছ ধরা পর্যন্ত ৫-২% হারে খাদ্য প্রয়োগ করা ভাল। মাছ খাদ্য খেয়ে শেষ করে কি না তা পরীক্ষা করে যতটুকু মাছ খায় ততটুকু প্রয়োগ করা ভাল। ভাসমান খাবার দিলে মাছ যতটুকু খায় ততটুকু খাদ্য প্রয়োগ করা সহজ হয়। নীচের স্মারণীতে উন্নত ব্যাপক পদ্ধতিতে মাছচাষের পকুরে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের নমুন দেয়া হলো-

সপ্তাহ	খাদ্য প্রয়োগের হার	খাদ্যের প্রকার
১ম দুই সপ্তাহ	১০%	স্টাটার-১
২য় দুই সপ্তাহ	৮%	স্টাটার-১
৩য় দুই সপ্তাহ	৭%	স্টাটার-২
৪র্থ দুই সপ্তাহ	৬%	স্টাটার-৩
৫ম দুই সপ্তাহ	৫%	গ্রোয়ার-১
৬ষ্ঠ দুই সপ্তাহ	৪%	গ্রোয়ার-১
৭ম দুই সপ্তাহ	৪%	গ্রোয়ার-২
৮ম দুই সপ্তাহ	৩%	গ্রোয়ার-২

মাস ভিত্তিক খাদ্য প্রয়োগের হিসাব

মাস	প্রতিদিন খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ (গ্রাম)	মাসওয়ারী সম্ভাব্য মাছের গড় ওজন (গ্রাম)
১ম মাস: ১-১৫ দিন	১৪০	৫০-৬০
১৬-৩০ দিন	৩০০	
২য় মাস: ১-১৫ দিন	৪২০	৯০-১১০
১৬-৩০ দিন	৫৯০	
৩য় মাস: ১-১৫ দিন	৬৬০	১৭০-১৮০
১৬-৩০ দিন	৮৫০	
৪র্থ মাস: ১-১৫ দিন	১০৫০	২৩০-২৫০
১৬-৩০ দিন	১১৫০	

কতবার সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে?

কার্প জাতীয় মাছ ও তেলাপিয়া	শিং, মাগুর, পাবদা ও গলদা চিংড়ি
প্রয়োজনীয় খাদ্য সমান দু'ভাগ করে একভাগ সকাল ১০-১১ টায় এবং অপরভাগ বিকেল ৩-৪ টায় প্রয়োগ করা ভালো।	প্রয়োগযোগ্য সম্পূরক খাদ্য তিন ভাগ করে এক ভাগ সকাল ১০-১১ টায় ও দুই ভাগ রাতে দুই বারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সন্ধ্যার পর ও রাত ১০-১১ টায়।

খাদ্য প্রয়োগে সতর্কতা

- প্রতিদিন একই সময় ও একই জায়গায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- খাদ্য প্রয়োগের ১৫-২০ মিনিট পরেও খাদ্য থেকে গেলে খাদ্যের পরিমান কমিয়ে দিতে হবে।
- মাঝে মাঝে খাদ্যদানী উঠিয়ে খাবার গ্রহনের পরিমাণ যাচাই করতে হবে।
- পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে বা বন্ধ রাখতে হবে।

খামারে খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা

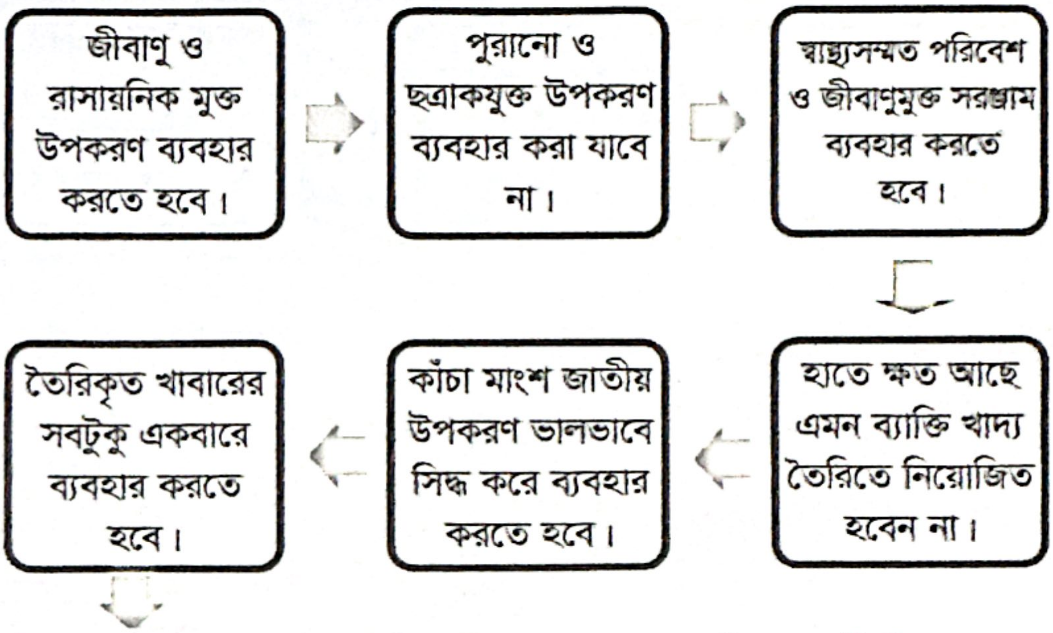

- জীবাণু ও রাসায়নিক মুক্ত উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।
- পুরানো ও ছত্রাকযুক্ত উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না।
- স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও জীবাণুমুক্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।
- হাতে ক্ষত আছে এমন ব্যাক্তি খাদ্য তৈরিতে নিয়োজিত হবেন না।
- কাঁচা মাংশ জাতীয় উপকরণ ভালভাবে সিদ্ধ করে ব্যবহার করতে হবে।
- তৈরিকৃত খাবারের সবটুকু একবারে ব্যবহার করতে হবে।

খাদ্য তৈরি শেষে খাদ্য তৈরির স্থান ও সরঞ্জামসমূহ পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

পিলেট খাদ্য তৈরি

চাষি নিজে পিলেট মেশিন ব্যবহার করে নিম্নের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে পিলেট খাদ্য তৈরি করে নিতে পারেন:

মাছের খাদ্য তৈরির সাধারণ ফর্মুলা (হাতে বানানোর জন্য)

প্রজাতি	কার্প মিশ্রচাষ	তেলাপিয়া/পাঙ্গাস	শিং-মাগুর	চিংড়ি	সব খাদ্যের সাথে প্রযোজ্য
অটোব্রান	৩০%	২৫%	২০%	১৫%	মলাসিস- ২%, লবন- ২%, ভিটামিন প্রিমিক্স ০.২৫%
ডিওআরবি	৩০%	২৫%	২০%	১৫%	
সয়াবিন খৈল	৩৫%	৪০%	৪০%	৪০%	
ফিসমিল	৫%	১০%	২০%	২০%	
এ্যাংকোর	০	০	০	১০%	

পিলেট খাদ্য তৈরির পদ্ধতি

নির্বাচিত উপাদানগুলো ভাল করে গুড়া করে চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে।

সমস্ত উপকরণ একটি পাত্রে ভাল করে মিশাতে হবে।

পিলেট তৈরির জন্য পরিমাণমত পানি মিশাতে হবে।

মিশানো উপকরণগুলো পিলেট মেশিনে দিয়ে পিলেট তৈরি করতে হবে।

বাণিজ্যিক মৎস্য খাদ্যের মান যাচাই

বাজার থেকে ভালো মানের খাদ্য বেছে নিতে সহায়ক এমন কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ-

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি	ভালো খাদ্যের লক্ষণ	নিম্নমানের খাদ্যের লক্ষণ
চেহার বা বাহ্যিক লক্ষণ	গা মসৃণ, চকচকে, গায়ে ধুলা নাই, চেহারায় নতুনভাব	গায়ে সাদা পাউডার যুক্ত, পুরাতন বলে মনে হয়
পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি	ভালো খাদ্যের লক্ষণ	নিম্নমানের খাদ্যের লক্ষণ

গন্ধ	শুটকি মাছের গন্ধ পাওয়া যায়	তেমন গন্ধ পাওয়া না
পানিতে ভিজিয়ে	খাদ্য উপকরণ ব্যতীত অন্য কোন উপাদান থাকে না	বালি/মাটি বা অন্য অপদ্রব্যের উপস্থিতি পাওয়া যায়

খাদ্য প্রয়োগে বিবেচ্য বিষয়

ক) খাদ্যের সাথে ভিটামিন প্রয়োগ

প্রাণির সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার খাদ্যে ভিটামিন পরিমানমত থাকা আবশ্যক। প্রাণির দেহে ভিটামিনের প্রয়োজন অল্প কিন্তু ঐটুকু না থাকলে বৃদ্ধি ব্যহত হয়; রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। একটি মোটর সাইকেল দুই লক্ষ টাকায় কেনা হয়। তার একটি ছোট্ট যন্ত্র প্লাগ। যার মূল্য মাত্র ১৫০ টাকা। ঐ প্লাগটি যদি মোটর সাইকেলে না থাকে তবে দুই লক্ষ টাকার মোটর সাইকেলটি অচল হয়ে যায়। ভিটামিনও তাই। খাদ্যের সাথে অন্যান্য উপাদান যথেষ্ট পরিমানে থাকলেও ভিটামিন প্রয়োজনীয় পরিমান না থাকে তবে আশানুরূপ বৃদ্ধি হয় না।

প্রয়োগ মাত্রা

প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে ৩ গ্রাম হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

মাছকে দিলে সুষম খাদ্য
অধিক ফলন মিলতে বাধ্য।

প্রয়োগ পদ্ধতি

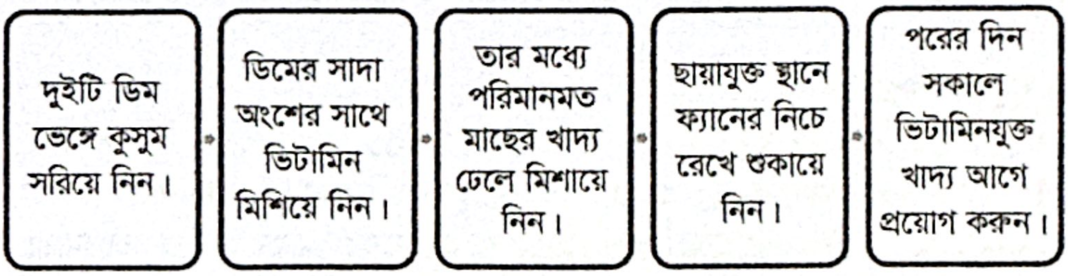
দুইটি ডিম ভেঙ্গে কুসুম সরিয়ে নিন। → ডিমের সাদা অংশের সাথে ভিটামিন মিশিয়ে নিন। → তার মধ্যে পরিমানমত মাছের খাদ্য ঢেলে মিশায়ে নিন। → ছায়াযুক্ত স্থানে ফ্যানের নিচে রেখে শুকায়ে নিন। → পরের দিন সকালে ভিটামিনযুক্ত খাদ্য আগে প্রয়োগ করুন।

খ) ক্ষেত্র বিশেষে রাতে খাদ্য প্রয়োগ

মাগুর, শিং, পাবদা ও গলদা চিংড়ির পুকুরে রাতে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এরা রাতে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক খাদ্য যেমন- জলজ পোকা, আলোতে আকৃষ্ট হয় এমন কীট পতঙ্গ ও পোকার ডিম, লার্ভা ইত্যাদি খায়। এ জন্য শিং, মাগুর, পাবদা ও গলদা চিংড়ির পুকুরে প্রয়োগযোগ্য সম্পূরক খাদ্য তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ দিনে ও দুই ভাগ রাতে দুই বারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সন্ধ্যার পর ও রাত ১০-১১ টায়।

গ) মাছকে পেট ভর্তি করে খাওয়ানো নয়

বর্তমানে অনেক চাষি অধিক ফলনের আশায় বা ইউটিউব বা ইন্টারনেটে দেখে মাছচাষের পুকুরে অতিরিক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ মাছকে পেট ভর্তি করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। হ্যাঁ সেই পুকুরে মাছকে পেট ভর্তি করে খাওয়ানো যাবে, যে সকল পুকুরে পানি ব্যবস্থাপনায় কতিপয় সুবিধা থাকে। যেমনঃ মাছ আহরণের পর বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা, বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা, পানি পরিবর্তনের সুযোগ ইত্যাদি। এসব সুযোগ না থাকলে কোনভাবেই বেশি খাদ্য প্রয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ মাছকে অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ করলে মাছ প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহন বন্ধ করে দেয়। এসব প্রাকৃতিক খাদ্য একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর মৃত্যুবরণ করে তলায় জমা হয়। একসময় এসব বর্জ্য পচে পুকুরে মাছের নানাবিধ সমস্যা তৈরি করে। এতে সম্পূরক খাদ্যের পিছনে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়। প্রাকৃতিক খাদ্যের অপচয় হয়। পুকুরের পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়। এছাড়া সৃষ্ট সমস্যা দূরিকরণে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়।

ঘ) পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের সঠিক সময়

শীতকাল ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে সাধারণত সকাল ১০-১১ টার মধ্যে ও বিকাল ৪-৫ টার মধ্যে। কারণ এসময় পুকুরে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা সন্তোষজনক থাকে। তবে শীতকালে পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের আগে পানির তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করে নিলে ভালো হয়। পুকুরে পানির তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার উপরে হলে স্বাভাবিক নিয়মে সম্পূরক খাদ্য দিতে হবে। পানির তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে মাছের মোট ওজনের ১ হতে ১.৫০ হারে প্রয়োগ করতে হবে। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে হলে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ না করা উত্তম। গভীর বা অগভীর নলকূপের পানি সরবরাহ করে পানির তাপমাত্রা বাড়ানো যায়।

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

খাদ্যের অপচয় রোধে ও পানির পরিবেশ ভালো রাখতে একাধিক খাদ্যদানীতে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

খাদ্যদানী ব্যবহার করা সম্ভব না হলে প্রতিদিন তলার নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

☐ প্রতিদিন একই সময়ে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

☐ পাড়ের কাছাকাছি খাদ্য প্রয়োগ করলে ভাল হয়।

পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

খাদ্যদানী

খাদ্যদানীতে খাবার দিলে খাবার অপচয় কম হয়। বাঁশ/কাঠের ১ বর্গমিটার আকারের একটি ফ্রেমে মশারীর জাল লাগিয়ে খাদ্যদানী তৈরি করা যায়। পুকুরের তলদেশের ৩০-৪০ সেন্টিমিটার উপরে বিঘা প্রতি ২-৩টি খাদ্যদানী স্থাপন করলেই চলে।

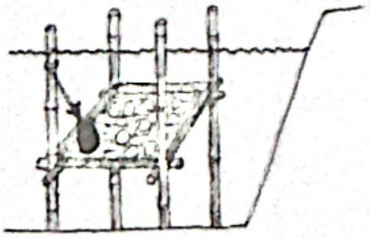

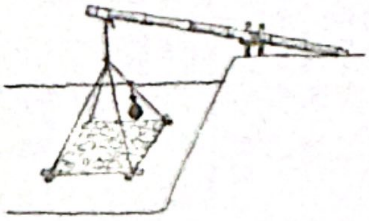

খাদ্য ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত উত্তম অভ্যাস

১ কারখানার উৎপাদিত অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত খাদ্য ব্যবহার করা যাবে না।

২ মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য ব্যবহার করা যাবে না। সদ্য তৈরি খাদ্য ক্রয় করতে হবে।

৩ গুদামে খাদ্য এমনভাবে রাখতে হবে যাতে আগে কেনা খাদ্য আগে ব্যবহার করা যায়।

৪ ক্রয়কৃত খাদ্য সর্বোচ্চ ১-২ মাসের বেশি মজুদ রাখা ঠিক নয়।

৫ গুদাম হিসেবে ঠান্ডা, শুষ্ক ও পরিষ্কার পাকা কক্ষ ব্যবহার করতে হবে।

৬ খাদ্য সংরক্ষণ কক্ষে যেন ইঁদুর জাতীয় প্রাণি ও কীটপতঙ্গ প্রবেশ করতে না পারে।

৪। পুনরায় চুন প্রয়োগ

পোনা মজুদের পর বিভিন্ন কারণে যেমন অতিরিক্ত খাদ্য বা সার প্রয়োগ, মাছের মল ইত্যাদির ফলে পুকুরের পানির পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। এতে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং রোগ জীবাণুর আক্রমণ ঘটে। এ সমস্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রতি মাসে বিঘা প্রতি ১০-১২ কেজি পাথুরে চুন ($CaCo_3$) পানিতে গুলে ঠান্ডা করে সকাল ৯-১০ টার দিকে পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

*নিয়মিত দিলে চুন
রোগের মুখে পড়ে আগুন।*

৫। প্রোবায়োটিক প্রয়োগ

প্রোবায়োটিক হলো উপকারী ব্যাক্টেরিয়া। বর্তমানে মাছচাষে প্রচুর সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। যার একটি অংশ পানিতে অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যায়। এছাড়া মাছের বিপাকীয় বর্জ্যও পানিতে জমা হয়। ফলে এগুলো পচে পানিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। যা মাছের জন্য ক্ষতিকর। উপকারী ব্যাক্টেরিয়া পানিতে বিদ্যমান অ্যামোনিয়াকে ভেঙ্গে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যে রূপান্তরের মাধ্যমে পানির বর্জ্য অপসারণ করে।

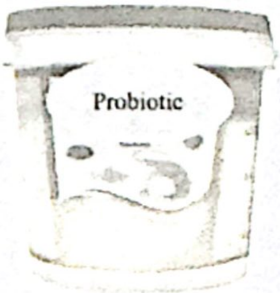

প্রয়োগ মাত্রা
প্রতি মাসে প্রতি বিঘা পুকুরে ৫০-৭০ গ্রাম।

প্রয়োগ পদ্ধতি
তিনগুণ বালির সাথে মিশিয়ে বিকেল বেলা সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৬। লবন প্রয়োগ

জীবানু নাশক হিসেবে পানিতে পুকুরে লবন প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দাঁতে বা গলায় ব্যাথা হলে হালকা গরম পানিতে লবন মিশিয়ে গড়গড়া করি। এতে আমাদের ব্যাথা উপশম হয়। পুকুরের পানিতে যদি নিয়মিত লবন প্রয়োগ করা হয় তবে মাছের রোগ-বালাই কম হয়। এছাড়া লবন এ্যামোনিয়ার টক্সিসিটি কমিয়ে দেয়। তবে র'সল্ট অর্থাৎ বাজারের খোলা লবন বেশি ভালো। কারণ র'সল্ট এ প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন খনিজ উপাদান থাকে। যা পানির গুণগতমান ভাল রাখতে সহায়তা করে।

প্রয়োগ মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
প্রতি দুই মাস অন্তর বিঘা প্রতি ১০-১২ কেজি।	পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৭। মাঝে মাঝে হররা টানা

তলার গ্যাস দূর করার জন্য প্রতি সপ্তাহে একবার হররা টানতে হবে। হররা সকাল ৯-১০ টার দিকে টানা ভালো।

৮। মাছের নমুনায়ন

নমুনায়ন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মাসে অন্ততঃ একবার মাছ ধরে মাছের বৃদ্ধির হার, মোট ওজন এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থা দেখা হয়। অনেক সময় দেখা যায় চাষি পুকুরে মাছ ছেড়ে চার মাস পর জাল টানলো। দেখলো মাছের গায়ে প্রচুর উকুন বা শরীরে ঘা। তখন কিন্তু রোগ প্রতিকারে বেগ পেতে হয়। এছাড়া পুকুরে মাছের সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণে নমুনায়ন অপরিহার্য।

কিভাবে নমুনায়ন করবেন

প্রতিটি প্রজাতির মাছের শতকরা ৫-১০ ভাগ ধরতে হবে। ➡ আলাদাভাবে কাপড়ের ব্যাগে নিয়ে ওজন করে গড় ওজন বের করতে হবে। ➡ প্রাপ্ত ওজনকে ঐ প্রজাতির মজুদকৃত মাছের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে জীবভর বের করতে হবে। ➡ প্রজাতি সমূহের জীবভর একত্রে যোগ করলেই ঐ পুকুরে স্থিত মাছের মোট ওজন জানা যাবে।

নমুনায়নে বিবেচ্য বিষয়

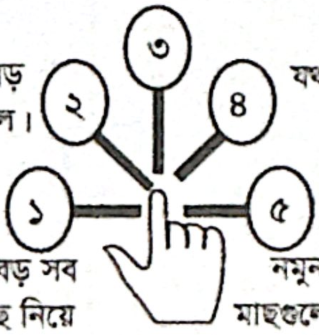

১। পুকুরে ছোট বড় সব আকারের মাছ নিয়ে নমুনায়ন করতে হবে।

২। নমুনায়নের ক্ষেত্রে বেড় জাল ব্যবহার করা ভাল।

৩। ঝাঁকি জাল ব্যবহার করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ ধরতে হবে।

৪। যথা সম্ভব দ্রুত নমুনায়ন শেষ করতে হবে।

৫। নমুনায়ন শেষে দ্রুত মাছগুলোকে আলতোভাবে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

৯। মাছ আহরণ: খাবার বা বিক্রির উদ্দেশ্যে পুকুর হতে মাছ ধরাই হচ্ছে আহরণ।

মাছ আহরণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

খাবার উপযোগী কিনা?

প্রতি শতাংশে কমপক্ষে ২০-২৫ কেজি মাছ হয়েছে কিনা?

বাজার মূল্য- রোজা, পুজা, বিয়ে ইত্যাদি সামনে থাকলে মাছের বাজার দর বেশি হয়।

ঝুঁকি: বর্ষা, খরা, শীত, চুরির সম্ভাবনা ইত্যাদি।

পোনার প্রাপ্যতা- আংশিক আহরণের পর পূণঃমজুদের ক্ষেত্রে।

কখন কিভাবে মাছ আহরণ করবেন?

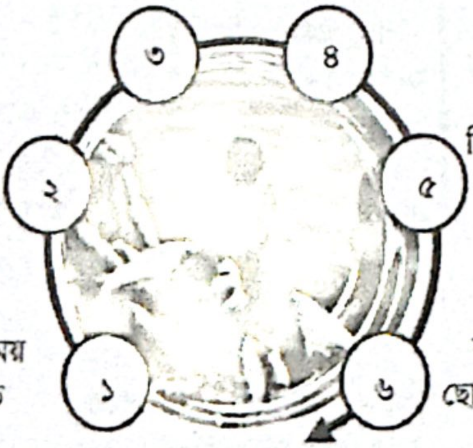

১ স্থানীয় বাজারের সময় বিবেচনায় রাখতে হবে।

২ ঠান্ডা, পরিষ্কার আবহাওয়ায় বিশেষ করে ভোরে ধরা উত্তম।

৩ তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে একসাথে সমস্ত মাছ ধরা ভালো।

৪ একই পুকুরে একই দিনে দু'বারের বেশি জাল টানা উচিত নয়।

৫ শিং মাছের পুকুরের সমস্ত পানি নিষ্কাশন সবচেয়ে কার্যকর।

৬ যথাশীঘ্র বড় মাছ ধরে ছোট মাছগুলো ছেড়ে দিতে হবে।

১০। মাছ বাজারজাতকরণ

মাছ বাজারজাতকরণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো আহরণকৃত মাছের গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখা।

এ লক্ষ্যে যা যা করণীয় তা হলো-

- স্বাস্থ্যকর পাত্রে সংরক্ষণ ও পরিবহন।
- আহরণের সময়কাল থেকে মৃত মাছে বরফ দেয়া।
- যতশীঘ্র সম্ভব বাজারজাত করা।

এক নজরে মজুদ পরবর্তী করণীয়

প্রতি দিনের কাজ

খাদ্য প্রয়োগ

- মাছের দেহের ওজনের ৩-২ ভাগ হিসেবে।
- মাসে ৭ দিন ভিটামিন যুক্ত করে প্রয়োগ। প্রতি কেজি খাদ্যে ৩ গ্রাম হিসেবে।

প্রতি সপ্তাহের কাজ

সার প্রয়োগ

৭-১০ দিন অন্তর অন্তর বিঘা প্রতি নিম্ন হারে সার প্রয়োগ-

খৈল-	৫ কেজি
টিএসপি-	৩ কেজি
ইউরিয়া-	৩ কেজি

প্রতি মাসের কাজ

চুন প্রয়োগ

- বিঘা প্রতি ১০-১২ কেজি।

প্রোবায়োটিক প্রয়োগ

- বিঘা প্রতি ৫০-৭০ গ্রাম।

প্রতি দুই মাসের কাজ

লবন প্রয়োগ

- বিঘা প্রতি ১০-১২ কেজি।

মাঝে মাঝে

হররা টানা

- তলার গ্যাস দূর করতে সকাল ৯-১০ টায়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা

- মাছের বৃদ্ধি, রোগ-বালাই, পরজীবী ইত্যাদি দেখা।

নিয়মিত কাজ

আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা।

পুকুরের কিছু সাধারণ সমস্যা ও তার প্রতিকার

চাষকালীন পুকুরে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন কমে যেতে পারে। নিচে মাছচাষের পুকুরের কতিপয় সাধারণ কারিগরি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১। পানির উপর সবুজ স্তর

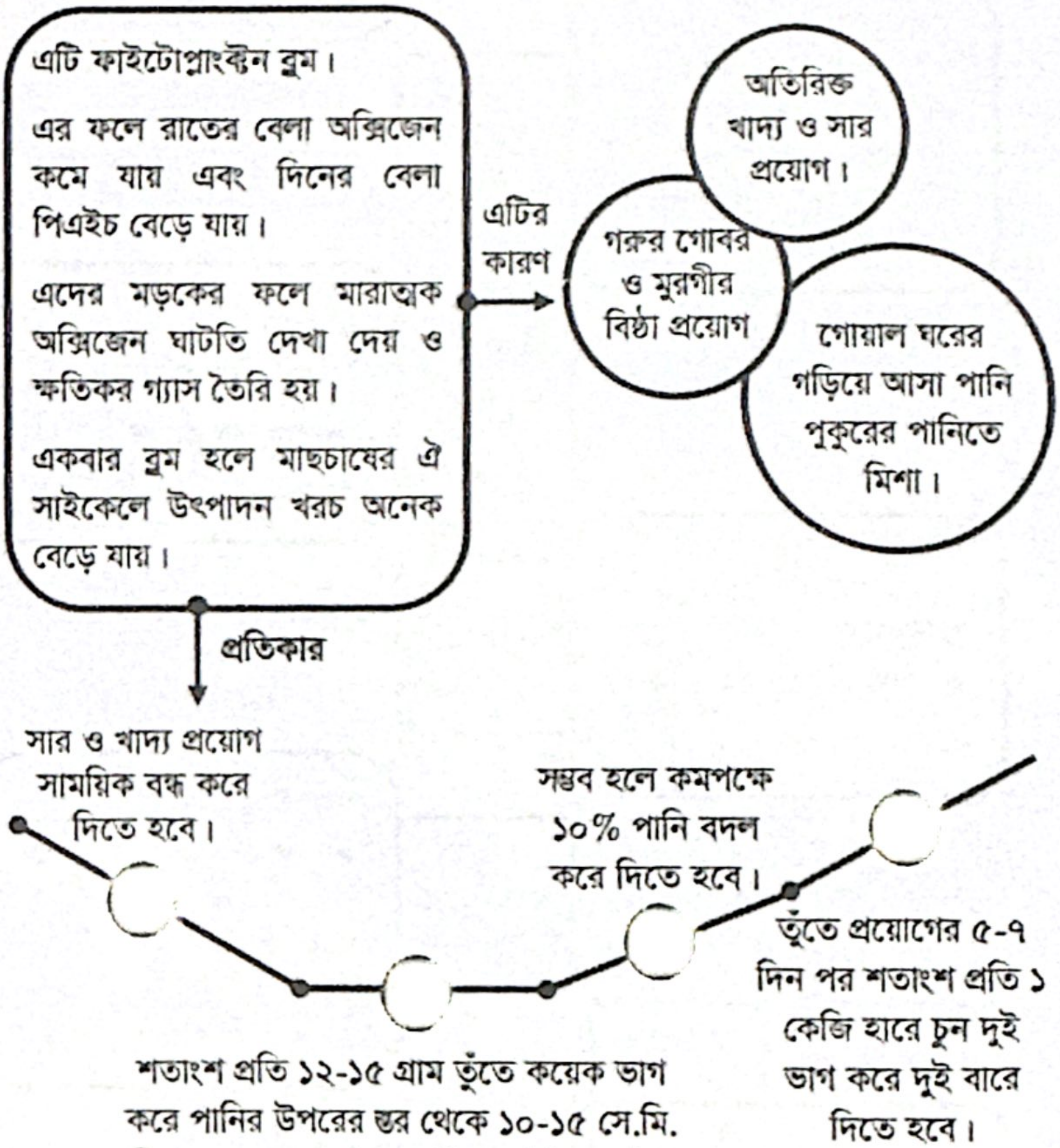

এটি ফাইটোপ্লাংক্টন ব্লুম।

এর ফলে রাতের বেলা অক্সিজেন কমে যায় এবং দিনের বেলা পিএইচ বেড়ে যায়।

এদের মড়কের ফলে মারাত্মক অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয় ও ক্ষতিকর গ্যাস তৈরি হয়।

একবার ব্লুম হলে মাছচাষের ঐ সাইকেলে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায়।

অতিরিক্ত খাদ্য ও সার প্রয়োগ।

গরুর গোবর ও মুরগীর বিষ্ঠা প্রয়োগ

গোয়াল ঘরের গড়িয়ে আসা পানি পুকুরের পানিতে মিশা।

সার ও খাদ্য প্রয়োগ সাময়িক বন্ধ করে দিতে হবে।

শতাংশ প্রতি ১২-১৫ গ্রাম তুঁতে কয়েক ভাগ করে পানির উপরের স্তর থেকে ১০-১৫ সে.মি. নীচে কাপড়ের পোটলায় বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে দিলে শেওলা কমে যাবে।

সম্ভব হলে কমপক্ষে ১০% পানি বদল করে দিতে হবে।

তুঁতে প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন দুই ভাগ করে দুই বারে দিতে হবে।

২। খাবি খাওয়া

পুকুরের পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে মাছ খাবি খায়।

এটির কারণ

- সূর্য্যের আলো বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। (এতে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন উৎপাদন হয় না।)
- পরিমিত শ্যাওলা না থাকা। (এতেও সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন উৎপাদন হয় না।)
- প্রাণিপ্লাংক্টন বেশি হওয়া। (এরা শ্যাওলা খেয়ে শেষ করে ফেলে।)
- পচন ক্রিয়া বেশি হওয়া। (অতিরিক্ত খাদ্য, পাতা-আগাছা, শ্যাওলার মড়ক।)
- মজুদ ঘনত্ব বেশি হওয়া। (অক্সিজেন গ্রহনকারী প্রাণির সংখ্যা বেড়ে যায়।)

সাময়িক প্রতিকার

- এ্যারেটর বা বাঁশ পিটিয়ে পানিতে ঢেউ সৃষ্টি করা।
- নলকূপের পানি ফোয়ারার মত করে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- বিঘা প্রতি ৫-৭ ফুট গভীরতার জন্য ৫০০ গ্রাম হিসেবে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ।
- বিঘা প্রতি ১৫ কেজি চুন+৩০০ গ্রাম অক্সিজেন রিয়েজেন্ট একত্রে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটানো।

৩। পানির উপর লাল স্তর

অতিরিক্ত লৌহ অথবা লাল শেওলার জন্য পানির উপরে লাল স্তর পড়তে পারে। ফলে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। পুকুরে খাদ্য ও অক্সিজেন ঘাটতি হয়।

প্রতিকার

- প্রতি বিঘায় ২.৫ কেজি রসুন বেটে পানিতে গুলে প্রয়োগ।
- শতাংশ প্রতি ১ ফুট পানির জন্য ১০০ গ্রাম হারে ফিটকিরী প্রয়োগ
- শ্যাওলার স্তরের ওপর শতাংশ প্রতি ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া ছিটানো।

৬। পুকুরে রেণূ ছাড়ার ৭-৮ দিন পর হাঁস পোকা দমনে করণীয়

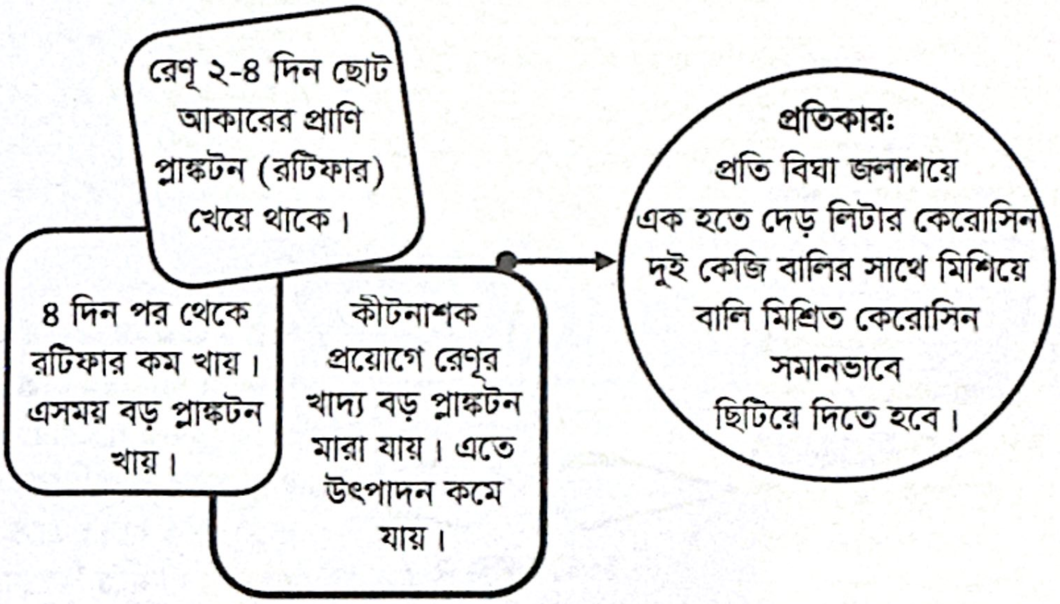

রেণূ ২-৪ দিন ছোট আকারের প্রাণি প্লাঙ্কটন (রটিফার) খেয়ে থাকে।

৪ দিন পর থেকে রটিফার কম খায়। এসময় বড় প্লাঙ্কটন খায়।

কীটনাশক প্রয়োগে রেণূর খাদ্য বড় প্লাঙ্কটন মারা যায়। এতে উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিকার:
প্রতি বিঘা জলাশয়ে এক হতে দেড় লিটার কেরোসিন দুই কেজি বালির সাথে মিশিয়ে বালি মিশ্রিত কেরোসিন সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৭। পুকুরের বিষাক্ততায় করণীয়

পুকুরে বিষ কিংবা বিষাক্ত ট্যাবলেট প্রয়োগে মাছ মেরে ফেলা নীতিগত কারণে কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তারপরও যদি এমন দূর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়; তাহলে নিম্নের কাজগুলো করতে হবে।

প্রতিকার:

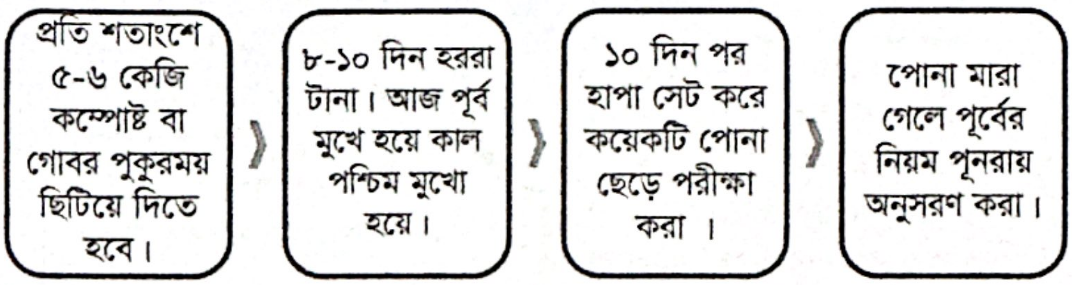

প্রতি শতাংশে ৫-৬ কেজি কম্পোষ্ট বা গোবর পুকুরময় ছিটিয়ে দিতে হবে।

৮-১০ দিন হররা টানা। আজ পূর্ব মুখে হয়ে কাল পশ্চিম মুখো হয়ে।

১০ দিন পর হাপা সেট করে কয়েকটি পোনা ছেড়ে পরীক্ষা করা ।

পোনা মারা গেলে পূর্বের নিয়ম পূনরায় অনুসরণ করা।

৮। রেণূর পুকুরে ব্যাঙাচি সমস্যা

ব্যাঙাচির অভ্যাস হলো সারাদিন পানিতে তলা থেকে উপর দিকে ওঠা-নামা করে। তখন যদি কোন পোনা তার মুখের কাছে পড়ে তাহলে তার পেট কেটে দেয়।

প্রতিকার: ১

ব্যাঙ বা ব্যাঙাচি দূর্গন্ধম স্থান এড়িয়ে চলে। তাই রেণুর পুকুরের পাড়ের চারিদিকে কেরোসিন বা হাইম্প্রিট ছিটিয়ে দিতে হবে।

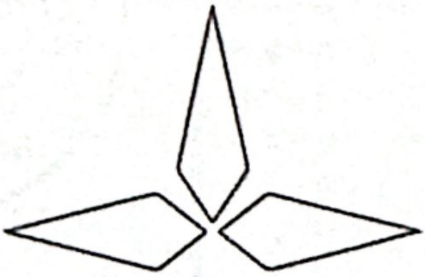

১: প্রতিকার: ২

প্রতিকার: ২

ব্যাঙ বা ব্যাঙাচির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পুকুর জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। এতে সহজেই ব্যাঙাচি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৯। অতিরিক্ত শামুক ও ঝিনুক হলে করণীয়

পুকুরের তলদেশের কাদায় শামুক বা ঝিনুক বেশি হলে জৈব ও অজৈব সার ব্যবহারে কোন কাজে আসে না। পানি টলটলে থাকে।

প্রতিকার

বিঘা প্রতি বড় আকারের ৪-৫ টি ব্লাক কার্পের পোনা ছাড়তে হবে।

নারিকেল বা তালের শুকনো ডাল পুকুরের পানিতে ফেলে রেখে এক দু-দিন পরপর পুকুর থেকে উঠিয়ে ফেলে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে শামুক বা ঝিনুকের মাংশ মাছের খাদ্য হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ৪-৫ ফুট পানির জন্য ৭৫০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ও ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে এক সপ্তাহের মধ্যে শামুক ও ঝিনুক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মাছের কতিপয় রোগ-বালাই ও তার প্রতিকার

বিভিন্ন কারণে মাছে রোগ-বালাই হতে পারে। সবচেয়ে বড় কারণ হলো পানির দূষিত পরিবেশ। দেখা গেছে পানির পরিবেশ খারাপ হলে মাছ দ্রুত রোগ-বালাই দ্বারা আক্রান্ত হয় ও মারা যায়। সেই তুলনায় রোগের অন্যান্য কারণ যেমন রোগ সৃষ্টিকারী প্রাণি, পুষ্টিকর পদার্থের অভাব ইত্যাদি অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। তাই রোগ ব্যবস্থাপনায় মাছের পরিবেশ তথা পানির গুণাগুণ বজায় রাখা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ ও মাছের স্বাস্থ্য

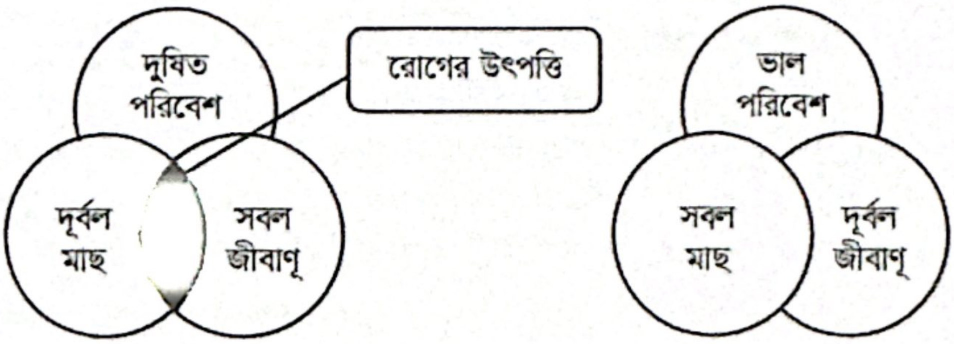
দুষিত পরিবেশ
রোগের উৎপত্তি
দূর্বল মাছ
সবল জীবাণু
ভাল পরিবেশ
সবল মাছ
দূর্বল জীবাণু

রোগের সাধারণ কারণসমূহ

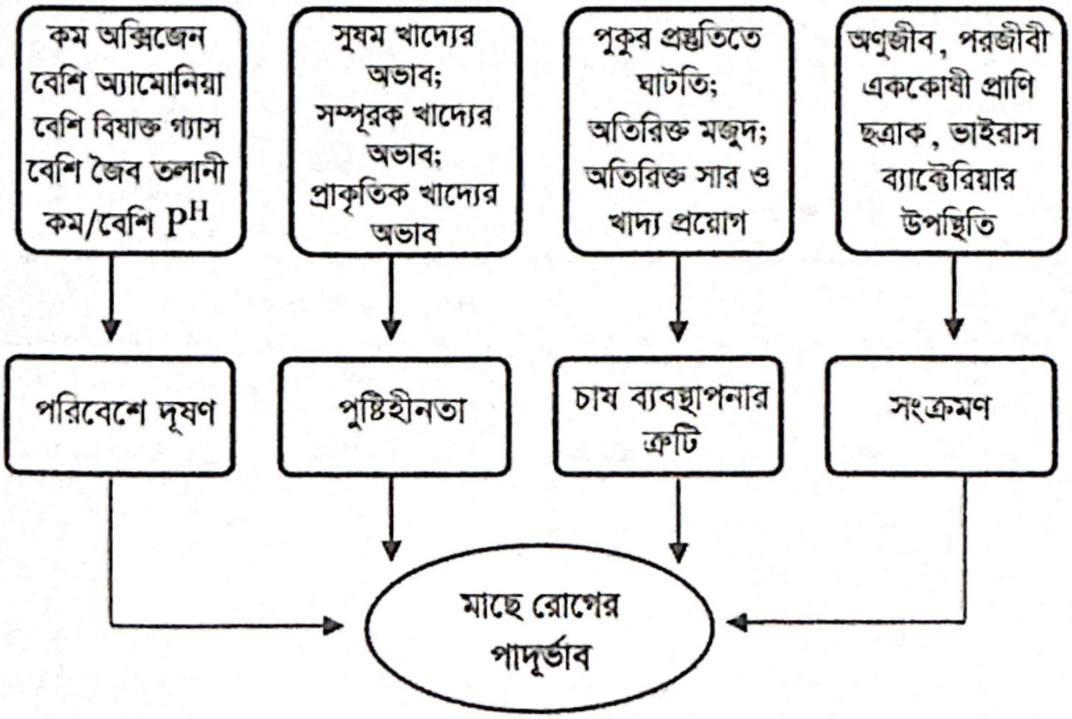
কম অক্সিজেন বেশি অ্যামোনিয়া বেশি বিষাক্ত গ্যাস বেশি জৈব তলানী কম/বেশি P^H
সুষম খাদ্যের অভাব; সম্পূরক খাদ্যের অভাব; প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব
পুকুর প্রস্তুতিতে ঘাটতি; অতিরিক্ত মজুদ; অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ
অণুজীব, পরজীবী এককোষী প্রাণি ছত্রাক, ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি
পরিবেশে দূষণ
পুষ্টিহীনতা
চাষ ব্যবস্থাপনার ত্রুটি
সংক্রমণ
মাছে রোগের পাদুর্ভাব

রোগের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ

খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়।।

দেহে পিচ্ছিল থাকে না বরং খসখসে হয়ে যায়।

মাছ পানির উপরে উঠে খাবি খায়।

মাছের দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাগ

উদ্দেশ্যহীনভাবে একাকি চলাফেরা করে।

মাছ কোন কিছুর সাথে গা ঘষতে থাকে।

মাছের উল্লেখিত লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। প্রাথমিকভাবে বিঘা প্রতি ১২ কেজি হিসেবে চুন ও ১২ কেজি হিসেবে লবন পানিতে গুলে আলাদাভাবে পুকুরে প্রয়োগ করে মাটি ও পানি জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ সবচেয়ে ভাল।
রোগ প্রতিরোধের সহজ পথ হলো-

যথাযথভাবে পুকুর প্রস্তুত করে পোনা ছাড়া।

অতিরিক্ত কাদা ও পঁচনশীল জৈব পদার্থ তুলে ফেলা।

পরিমাণমত সুস্থ্য পোনা ছাড়া।

অবাঞ্ছিত প্রাণি ও পানি পুকুরে ঢুকতে না দেয়া।

পোনা শোধণ করে ছাড়া।

গোবর ও মুর্গির বিষ্ঠা ব্যবহার না করা

পরিমিত সার ও খাদ্য প্রয়োগ করা।

পচনক্রিয়া সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা।

এছাড়াও

১ প্রতি মাসে বিঘা প্রতি ১০-১২ কেজি চুন প্রয়োগ করা।

২ প্রতি দুই মাস অন্তর বিঘা প্রতি ১০-১২ কেজি লবন প্রয়োগ করা।

মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

মাছের ক্ষত রোগ

পুকুরের দূষিত পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে মাছে এই রোগ হয়।

লক্ষণ: মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে প্রথমে লাল দাগ দেখা যায় পরবর্তীতে ঘা হয়ে যায়।

+

লাল ফুটকী রোগ

লক্ষণ: দেহের বিভিন্ন অংশে লালদাগ দেখা যায়। দাগগুলোতে টিপ দিলে রক্তের মতো বের হয়।
কারণ: তলায় অতিরিক্ত কাদা, অধিক মজুদ ঘনত্ব ও ব্যাকটেরিয়া।

+

লেজ ও পাখনা পঁচা রোগ

লক্ষণ: লেজ ও পাখনা পচে যায়। পাখনা ছিঁড়ে সাদা হয়ে যেতে পারে।
কারণ: পুকুরের তলার অতিরিক্ত জৈব পদার্থ. ব্যাকটেরিয়া।

+

পায়ু ও পাখনার গোড়া লাল

লক্ষণ পায়ু ও পাখনার গোড়া ফ্যাকাসে লাল হয়ে যায়। চক্ষু লালচে হয়। আঁইশ উঠে যেতে পারে। শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিকার:

- পুকুরে বিঘা প্রতি ১৫ কেজি চুন ও ১৫ কেজি হারে লবন তিন সপ্তাহে তিন বার প্রয়োগ।
- প্রতি কেজি খাবারের সাথে ৬০ মিলিগ্রাম হারে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন দুই সপ্তাহ প্রয়োগ।
- পুকুরে বিঘা প্রতি ৫-৭ ফুট পানির গভীরতার জন্য ৫০০ গ্রাম হিসেবে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ।
- নলকূপের পানি সরবরাহ করে পুকুরের পানির গভীরতা বাড়ানো।

মাছের উকুন

আরগুলাস নামক পরজীবী। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে এদের বৃদ্ধি ঘটে।

লক্ষণ: মাছ অবিরাম ছোটাছুটি করে। কোন কিছুর সাথে গা ঘষতে থাকে। দেহ লাল বর্ণ ধারণ করে ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আইশের উপর ক্ষুদ্রাকার উকুন দেখা যায়।

এংকর ওয়ার্ম

লার্নিয়া নামক পরজীবী। পুকুরে বড় জুপ্লাংকটন থাকলে মাছের দেহে ক্ষত সৃষ্টি করে যেখানে এটি আক্রমন করে। মাছের শরীরের রক্ত চুষে নেয়। সুতার মত ঝুলতে দেখা যেতে পারে।

লক্ষণ: মাছের দেহে ক্ষত ও ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়। মাছ খাদ্য গ্রহন বন্ধ করে দেয় ও দ্রুত দূর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার:

১) বিঘা প্রতি ৫ ফুট গভীরতার জন্য ৫০০ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পানিতে গুলে প্রয়োগ।

২) একর প্রতি ৫ ফুট গভীরতার জন্য ৪০ মিলি Deletix বা বিঘা প্রতি ৫০ মিলি হারে রিপকর্ড, ডেসিস, এসিমিক্স ইত্যাদি পর পর তিন সপ্তাহ সন্ধ্যার সময় প্রয়োগ।

ফুলকা পচা রোগ

কার্প জাতীয় মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়। গরমে বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ: ফুলকা লাল দাগ দেখা যায় পরে সাদা হয়ে যায়।

প্রতিকার:

১) পুকুরে বিঘা প্রতি ৫-৭ ফুট পানির গভীরতার জন্য ১৫ কেজি হিসেবে চুন ও ১৫ কেজি হিসেবে লবন প্রয়োগ। পরপর তিন সপ্তাহ।

২) বিঘা প্রতি ৫-৭ ফুট পানির গভীরতার জন্য ৫০০ গ্রাম ম্যালাকাইট গ্রীন পানিতে গুলো প্রয়োগ । পরপর তিন সপ্তাহ।

গায়ে তুলার মত
(ছত্রাক রোগ)

আক্রান্ত মাছের ক্ষতস্থানে তুলার ন্যায় ছত্রাক দেখা যায়। মাছ ধীর গতিতে একা একা চলা ফেরা করে।

শরীরে নীলাভ-ধূসর মিউকাস
(কাইলোডেনা)

এক ধরণের পরজীবী। নীলাভ-ধূসর মিউকাস দ্বারা শরীর আবৃত হয়। মাছ লাফালাফি করে। ফুলকার টিসু ফুলে যায়। ছোট মাছ বেশি আক্রান্ত হয়।

প্রতিকার

১) বিঘা প্রতি ৫ ফুট পানির গভীরতার জন্য ২ লিটার হিসেবে ফরমালিন পুকুরে প্রয়োগ করা।

২) বিঘা প্রতি ৫-৭ ফুট পানির গভীরতার জন্য ১২ কেজি হিসেবে চুন ও ১২ কেজি হিসেবে লবন প্রয়োগ। পরপর তিন সপ্তাহ।

শীতকালীন বিশেষ সতর্কতা

ডোবা বা নালার পানি ও মাছ পুকুরে প্রবেশ করানো যাবে না।

শীতের শুরুতেই বিঘা প্রতি ১২ কেজি চুন ও ১২ কেজি লবন আলাদাভাবে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জালটানা যাবে না। প্রয়োজন হলে জাল ব্যবহারের পুর্বে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট হিসেবে তৈরি দ্রবনে শোধন করে নিতে হবে এবং কড়া রোদে শুকাতে হবে।

এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ পদ্ধতি

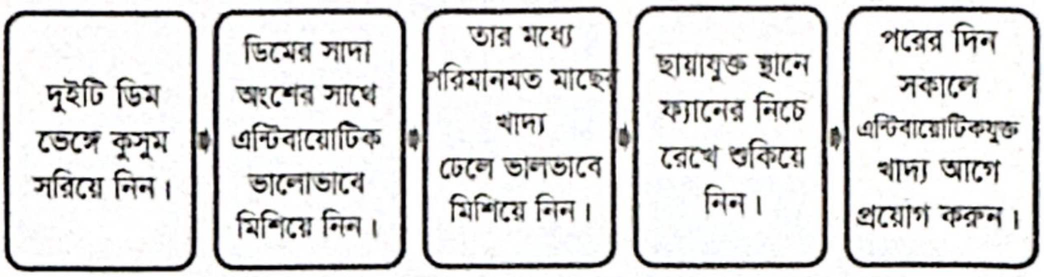
দুইটি ডিম ভেঙ্গে কুসুম সরিয়ে নিন।
ডিমের সাদা অংশের সাথে এন্টিবায়োটিক ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
তার মধ্যে পরিমানমত মাছের খাদ্য ঢেলে ভালভাবে মিশিয়ে নিন।
ছায়াযুক্ত স্থানে ফ্যানের নিচে রেখে শুকিয়ে নিন।
পরের দিন সকালে এন্টিবায়োটিকযুক্ত খাদ্য আগে প্রয়োগ করুন।

এন্টিবায়োটিক প্রয়োগে বিশেষ শতর্কতা

মাছের জন্য কোন এন্টিবায়োটিক নাই। মানুষের এন্টিবায়োটিক মাছকে খাওয়ানো হয়। আশংকার কথা হলো মৎস্য খামারীগণ যত্রতত্র উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করছেন।

গবেষকগণ এন্টিবায়োটিকের তিনটি ক্যাটাগরী করেছেন।

ক্যাটাগরী-১: অকার্যকর এন্টিবায়োটিক। অর্থাৎ যে এন্টিবায়োটিক পূর্বে মানুষের দেহে কার্যকর ছিল। এখন আর মানুষের শরীরে কোন কার্যকারীতা নাই। এন্টিবায়োটিক কার্যকারিতা হারায় তিনটি কারণে। ক) সঠিক ডোজ অনুসরণ না করা। খ) সঠিক সময় ধরে ব্যবহার না করা। এন্টিবায়োটিক সর্বনিম্ন ৩ দিন খেতে হয়। কিন্তু সে সময় ধরে না খাওয়া। গ) নিয়মিত কিছু কিছু এন্টিবায়োটিক মানুষের শরীরে আসা। যেমন: মাছের খাদ্যে, মুরগীর খাদ্যে ব্যবহার করলে মাছ ও মুরগী থেকে এন্টিবায়োটিক মানুষের শরীরে আসে।

ক্যাটাগরী-২: কার্যকর এন্টিবায়োটিক। অর্থাৎ যে সকল এন্টিবায়োটিক এখনও মানুষের দেহে কার্যকর রয়েছে।

ক্যাটাগরী- ৩: রিজার্ভ এন্টিবায়োটিক। অর্থাৎ বর্তমানে কার্যকর ক্যাটাগরীর এন্টিবায়োটিক যদি মানুষের শরীরে অকার্যকর হয়ে যায় তবে রিজার্ভ থেকে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ভয়ের ব্যাপার হলো রিজার্ভ ক্যাটাগরীর এন্টিবায়োটিকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বর্তমানে কার্যকর এন্টিবায়োটিকগুলো অকার্যকর হয়ে গেলে রিজার্ভ থেকে নিয়ে মানুষের দেহে প্রয়োগ করতে হবে। যদি সেগুলো অকার্যকর হয়ে যায় তবে শর্দি, জ্বর ভালো করার জন্য এন্টিবায়োটি পাওয়া যাবে না। তাই আমাদের এখনই সাবধান হতে হবে। আমরা যদি পানির পরিবেশ ভাল রাখি তবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে না।

ঔষধের ব্যবহার সম্পর্কিত গুড-প্রাকটিস

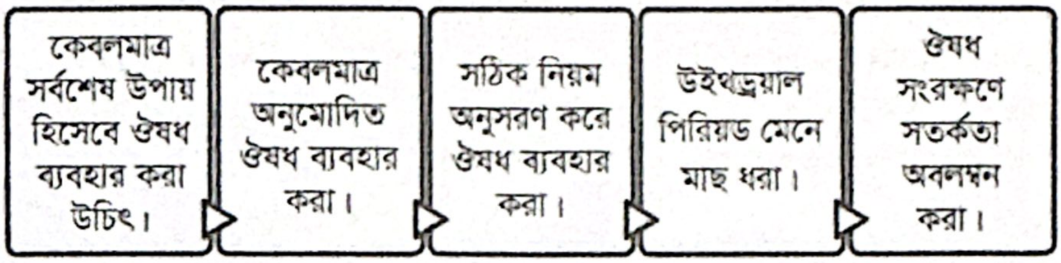
কেবলমাত্র সর্বশেষ উপায় হিসেবে ঔষধ ব্যবহার করা উচিৎ।
কেবলমাত্র অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করা।
সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে ঔষধ ব্যবহার করা।
উইথড্রয়াল পিরিয়ড মেনে মাছ ধরা।
ঔষধ সংরক্ষণে সতর্কতা অবলম্বন করা।

ঔষধের অবশেষ নিঃশেষের সময় (উইথড্রয়াল টাইম) অনুসরণ

মাছের দেহে ঔষধের অবশেষ নিঃশেষের সময় বলতে ঐ সময় বুঝায় যে সময়ের মধ্যে মাছের দেহ থেকে প্রয়োগকৃত ঔষধের অবশেষ (রেসিডিউ) নিঃশেষ হয় বা গ্রহনযোগ্য মাত্রায় নেমে আসে।

চাষকালীন রোগ নিরাময়ের জন্য এ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণূ নাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এ্যান্টিবায়োটিক ও জীবাণূনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে মাছের দেহে এ্যান্টিবায়োটিক ও জীবাণূনাশকের অবশেষ থেকে যায় যা মানবদেহে বাহিত হতে পারে। কাজেই কোন ঔষধ ব্যবহারের পর তার উইথড্রয়াল পিরিয়ড বা অবশেষ নিঃশেষের সময়ের প্রতি সজাগ থাকতে হবে। ঔষধের প্যাকেটের গায়ে উইথড্রয়াল পিরিয়ড সাধারণত দুই ভাবে লেখা থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঔষধ ব্যবহারের এত দিন পর ফসল আহরণ করুন লেখা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে উইথড্রয়াল পিরিয়ড ডিগ্রি দিন হিসাবে লেখা থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কোন ঔষধের উইথড্রয়াল পিরিয়ড ২৫০ ডিগ্রি দিন। অর্থাৎ ঐ ঔষধ ব্যবহারের সময় দিনের গড় তাপমাত্রা যত হবে; ধরি গড় তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে এই ২৫ দিয়ে ২৫০ কে ভাগ করলে ১০ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ঐ ঔষধ ব্যবহারের ১০ দিন পর ফসল আহরণ করা যাবে।

***

মাছচাষে কতিপয় নিরাপদ রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

১। লবণের ব্যবহার

মাছচাষে লবণের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। বহুল ব্যবহৃত খাদ্য লবণের রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড (Nacl)। একেবারে পানি (distilled water) ব্যতীত সব পানিতেই কিছু না কিছু লবণ থাকে। পানিতে বিদ্যমান খনিজ লবণগুলো মাছের জৈবিক কার্যাবলীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

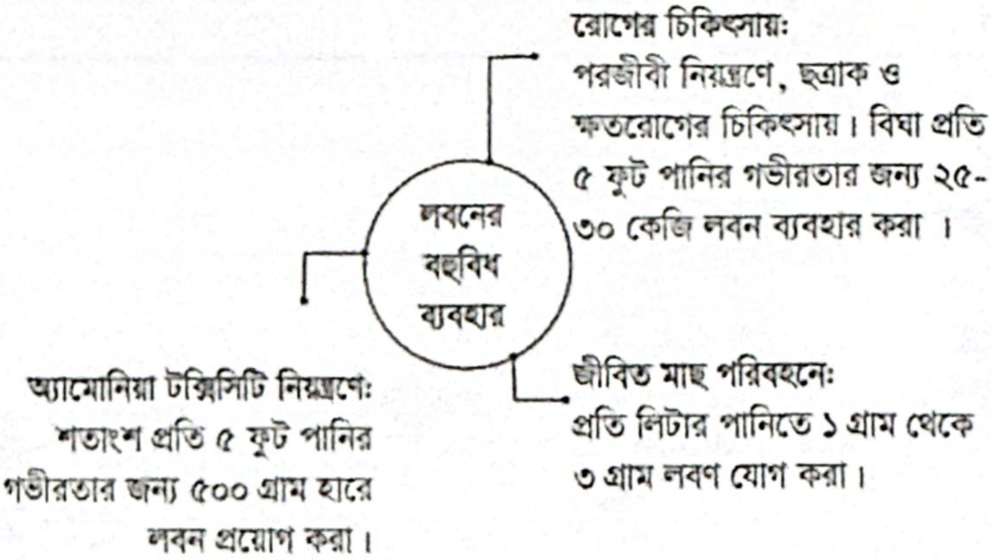

রোগের চিকিৎসায়:
পরজীবী নিয়ন্ত্রণে, ছত্রাক ও ক্ষতরোগের চিকিৎসায়। বিঘা প্রতি ৫ ফুট পানির গভীরতার জন্য ২৫-৩০ কেজি লবন ব্যবহার করা ।

অ্যামোনিয়া টক্সিসিটি নিয়ন্ত্রণে:
শতাংশ প্রতি ৫ ফুট পানির গভীরতার জন্য ৫০০ গ্রাম হারে লবন প্রয়োগ করা।

জীবিত মাছ পরিবহনে:
প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম থেকে ৩ গ্রাম লবণ যোগ করা।

২। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ($KMnO_4$) ব্যবহার

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) বা ডাক্তারি পটাশ। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহারের ফলে পুকুরের পানিতে বিদ্যমান এ্যালজি, ব্যাকটেরিয়া ও তলদেশের জৈব পদার্থের উপর ক্রিয়া করে।

যে সকল প্রয়োজনে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা হয়-

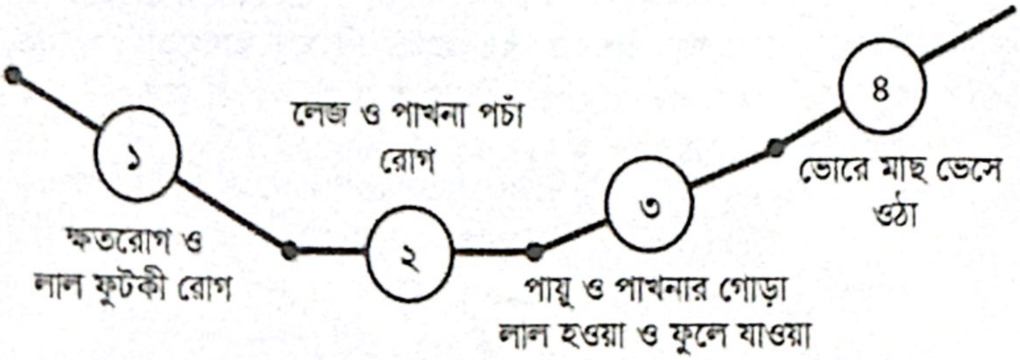

১ ক্ষতরোগ ও লাল ফুটকী রোগ

২ লেজ ও পাখনা পচাঁ রোগ

৩ পায়ু ও পাখনার গোড়া লাল হওয়া ও ফুলে যাওয়া

৪ ভোরে মাছ ভেসে ওঠা

প্রয়োগ মাত্রা: বিঘা প্রতি ৫ ফুট পানির গভীরতার জন্য ৫০০ গ্রাম হিসেবে।

৩। ফরমালিনের ব্যবহার

ফরমালিন হলো ফরমালডিহাইড গ্যাসের ৩৭% জলীয় দ্রবণ যা মাছের বাহ্যিক পরজীবীর বিরুদ্ধে কার্যকর। তবে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক আক্রমণের বিরুদ্ধে তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর। মাছের ডিমে ছত্রাকের আক্রমণের ক্ষেত্রে ফরমালিনের ব্যবহার বেশ কার্যকরি।

যে সব রোগের চিকিৎসায় ফরমালিন ব্যবহার করা হয়:

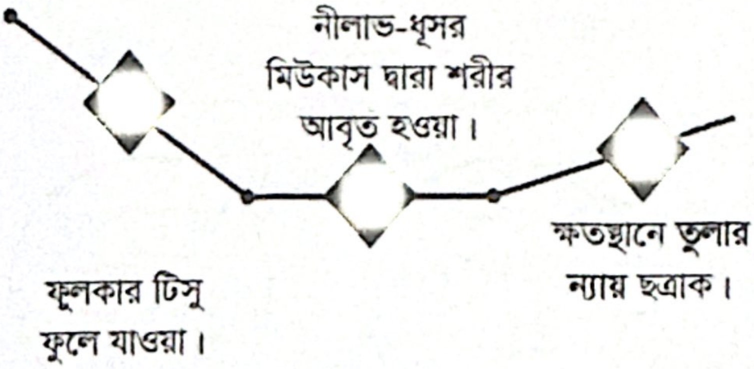
নীলাভ-ধূসর মিউকাস দ্বারা শরীর আবৃত হওয়া।
ক্ষতস্থানে তুলার ন্যায় ছত্রাক।
ফুলকার টিসু ফুলে যাওয়া।

প্রয়োগ মাত্রা:
বিঘা প্রতি ৫ ফুট পানির গভীরতার জন্য ৫ লিটার।

সিমেন্টের ট্যাংকে মাছ চাষ ও অ্যাকুরিয়ামের মাছের পরজীবী দমনে খুবই কার্যকর।

৪। তুঁতের ব্যবহার

পুকুরের পানির অ্যালজি (শ্যাওলা) দমন এবং পরজীবীর আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ উভয় ক্ষেত্রেই তুঁতে সমভাবে কার্যকর। আমরা বাজারে তুঁতে নামে কপার সালফেট ($CuSo_4$) পাই। এটি পাউডার হিসাবে থাকে যা সহজলভ্য এবং সস্তা।

তুঁতে ব্যবহারের ক্ষেত্র ও প্রয়োগ মাত্রা

শ্যাওলা দমনে তুঁতে ব্যবহার করা হয়।
পরজীবী দমনে তুঁতে ব্যবহার করা হয়।
বিঘা প্রতি ৫ ফুট পানির গভীরতার জন্য ৩০০ গ্রাম।

অ্যালজি নিধনের জন্য পুকুরের পানিতে তুঁতে ব্যবহার করা হলে পানির অক্সিজেন ঘনত্ব হ্রাস পেতে পারে যার ফলে পুকুরের মাছ মারাও যেতে পারে। কারণ পুকুরের

পানিতে অ্যালজি হলো অক্সিজেন সরবরাহের প্রধান উৎস। আবার মৃত অ্যালজি গুলো পচনের সময় পানির অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। কাজেই তুঁতে ব্যবহারের ৫-৭ দিন পর পুকুরে বিঘা প্রতি ১৫ কেজি চুন পানিতে গুলে প্রয়োগ করতে হবে।

৫। জিওলাইটের ব্যবহার

জিওলাইট মূলতঃ প্রাকৃতিক খনিজ যা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। জিওলাইট সূক্ষ ছিদ্রযুক্ত ত্রিমাত্রিক ক্রিস্টালধর্মী সুসংহত আকৃতি বিশিষ্ট আকরিক যা তাদের গঠনের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন ও অক্সিজেন ধারণ করে এবং ছিদ্রগুলোতে ক্যাটায়ন (ঋণাত্বক আয়ন) ও পানি থাকে।

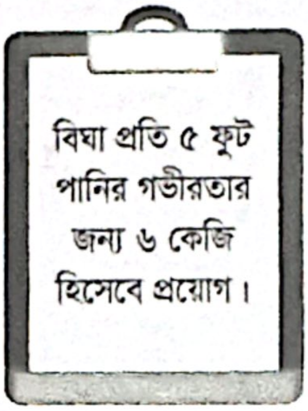

বিঘা প্রতি ৫ ফুট পানির গভীরতার জন্য ৬ কেজি হিসেবে প্রয়োগ।

যে সকল ক্ষেত্রে জিওলাইট ব্যবহার করা হয়-

পানির হার্ডনেস আয়ন দূর করণে

=

অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস দূর করণে

পানির হার্ডনেস আয়ন দূরীকরণের জন্য সবচেয়ে দক্ষ হলো সোডিয়াম সমৃদ্ধ জিওলাইট। পুকুরের পানি থেকে অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস দূর করার ক্ষেত্রে জিওলাইট খুব দক্ষতার সাথে কাজ করে।

৬। ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার

ব্লিচিং পাউডারের মূল উপাদান হলো ক্লোরিন। মাছের নার্সারী বা উৎপাদন পুকুরে মাছের গায়ে ইনফেকশন দেখা দিলে ব্লিচিং পাউডার দ্বারা চিকিৎসা করা যায়। বাজারে দুই ধরণের ব্লিচিং পাউডার (৬০% এবং ৩৫% মাত্রার) পাওয়া যায়। ব্লিচিং পাউডার বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য।

উৎপাদন পুকুরে ইনফেকশন দেখা দিলে ২ পিপিএম মাত্রার ক্লোরিন প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্লিচিং পাউডারের (৬০%) পরিমান হবে ১০০০ লিটার পানিতে ৩.৫ গ্রাম। আর ৩৫% মাত্রার ব্লিচিং পাউডার হলে ১০০০ লিটারে ৬ গ্রাম। ব্লিচিং পাউডারের পরিবর্তে ৩০ পিপিএম মাত্রায় ড্রামের ফরমালিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

***